শিক্ষিতা

পতিতার আত্ম-চরিত

কুমারী—শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত

আর, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
২৭ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

দেড় টাকা।

শিক্ষিতা

পতিতার আত্ম-চরিত

কুমারী—শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত

আর, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
২৭ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

দেড় টাকা।

Publisher—
R. Chakravartty Choudhury
27 Harrison Road
Calcutta,

PRINTER—
DIBYENDRA KUMAR ROY.
R. L. Press.
28, Sanker Ghose Lane. Calcutta

উৎসর্গ

তরুণ বাংলার তরুণ তরুণী সমাজ সংস্কারকদিগের
হস্তে অর্পণ করিলাম ।

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৩৬
দ্বিতীয় সংস্করণ কার্ত্তিক ১৩৩৬

আমার কৈফিয়ৎ

পুস্তকের না[illegible]খিয়া অনেকেই হয়ত মনে করিবেন যে এই প্রকার জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্য কি! মহৎ জীবনীর উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাহা সমাজের পূর্ণ চিত্র নহে। আমার জীবন মোটেই মহৎ নহে, অধিকন্তু ঠিক তাহার বিপরীত; কিন্তু পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ। আমি পাপী, কলঙ্কিনী, যশের প্রার্থী নহি—সুতরাং আমার জীবনের খাঁটি কথাগুলি আমি যেমন অকপটে বলিতে পারিব, কোন মহৎই তাঁহার জীবনের ঘটনা তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পারেন না। পাপের স্বরূপ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। পাপ জিনিষটা যে কি কৈশোরে তাহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আজ আমি—আমি কেন—আমার মত সহস্র সহস্র নারী পতিতা।

বারবনিতা-জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এবং অনুতাপ ভোগ করিয়াছি তাহারই স্মৃতি লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের জীবনকে সুখময় মনে করেন—আমাদের সংস্পর্শে আসিতে আগ্রহান্বিত--তাঁহারা বুঝিবেন এ পৃথিবীতে যদি নরক থাকে তবে তাহা আমাদের জীবন।

আমি সমাজের ঘৃণীতা, অস্পৃশ্যা—সমাজে আমার স্থান নাই স্থান থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধু-বেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতে তাহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। এই ভণ্ডের দল কি

প্রকারে অবোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করে, তাহার চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

আমার এই আত্ম জীবনীতে ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺স্যার সুরেন্দ্র নাথ, ৺দেশবন্ধু দাশ, ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, ঊর্দ্মিল দেবী, সুনিতী দেবী, মোহিনী দেবী, সরলা দেবী, হেমপ্রভ মজুমদার, বগলা সোম, লেডী অবলা বসু, কামিনী রায়, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী, রমলা গুপ্তা, লীলাবতী দাশ;

শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহেশ চন্দ্র আতর্থী; কাজি নজরুল ইছলাম ও তৎপত্নী, মতিলাল নেহরু ও তৎকন্যা এবং সৈয়দ হুসেন, কুমার গোপীকা রমণ রায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আক্রাম খাঁ, আবদুল রহিম, ডাঃ বিমল চন্দ্র ঘোষ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বীরেন শাসমল, জিতেন্দ্রলাল, হেমন্ত সরকার, প্রতাপ গুহরায়,

৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ৺অমৃতলাল বসু, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্র লাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত;

স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ তারকেশ্বরের মহান্ত প্রভৃতি মহোদয় ও মহোদয়ার নাম প্রয়োজন বশতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মত নূতন লেখিকার অক্ষমতার দোষে যদি তাঁহাদের সুনামের কোন হানি হইয়া থাকে এজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এবং মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি

এই জীবনীতে আমার ফটো চিত্র দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র বানার্জ্জি, উকিল মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।

আমার পিতৃতুল্য এক ব্যক্তি এই পুস্তিকার প্রুফ্ সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্য স্থানে স্থানে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এজন্য পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিনিতা

শ্রীমতী মানদা দেবী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বিশ্বনাথের কৃপায় কয়েক দিনের মধ্যে পুস্তকের দ্বিতীয়বার মুদ্রনের প্রয়োজন হইল। এই সংস্করণে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে।

আমার এই জীবনীতে ইঞ্জিনীয়ার কন্যা সুরুচীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। সুরুচীর ভ্রাতা এজন্য পুস্তকের প্রকাশক এবং আমার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়নের উদ্দেশ্যে, উকিল দ্বারা এক নোটীশ দিয়াছেন। নোটীশে বলা হইয়াছে —"সুরুচী পতিতা নহে, সে আমার বাড়ী যাইত না, আমি ভদ্রলোকের কন্যা জানিয়া গৃহস্থ হইয়াও সে আমাকে তাহার বাড়ীতে যাইয়া তাহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিয়াছিল.

সুরুচী কৃষ্ণকুমার বাবুর জামাতার ঘড়ি চুরি করে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।”

নোটীশের কোন জবাব আমি দেই নাই এবং দিব না, মোকদ্দমার প্রতীক্ষায় রহিলাম, যদি মোকদ্দমা হয় তবে পতিতা সমাজের এমন ঘটনা বাহির হইবে যাহাতে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

আমার এই জীবনী আমার নিজের লেখা কি অন্য পুরুষের লেখা,তাহা লইয়া একদল লোক মাথা ঘামাইতেছেন শুনিতেছি নারী সম্বন্ধে পুরুষের নানা প্রকার হীন ধারণার জন্যই নারী আজ বিশ্বে সমানাধিকার দাবী না করিয়া পারিতেছেন না॥ যদি তাঁহারা কেবল ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে—পতিতার কি বই লিখিবার ক্ষমতা আছে—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে—পতিতগণ যদি বই লিখিতে পারেন,তবে পতিতাগণ পারিবে না কেন? বিশেষতঃ পতিতগণের লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট আদর আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতিভার পরিমাপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রি দ্বারা হয় না। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীর কোন ডিগ্রি নাই, ইহারা হিন্দু ঘরের সেকেলে মেয়ে, রিয়েলিষ্টিক্ আর্টে'রও কোন ধার ধারেন না, কিন্তু ইঁহাদের লেখনী হইতে যেমন লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন উপাধিধারিনী তেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক যে লিখিতে পারেন নাই; তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

“ভোটে পতিতার স্থান” নামক একটি অধ্যায় এই পুস্তকের

জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিকের মতামত গ্রহণ না করিতে পারায় এবারেও মুদ্রিত হইল না। আমার লিখিবার অক্ষমতায় অথবা অজ্ঞতার জন্য যদি কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের কোন হানী হয়, এজন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল। যদি সুযোগ ও সুবিধা হয় তবে তাহা গ্রন্থাকারে পৃথক মুদ্রিত হইবে।

আমার জীবনীতে যাঁহাদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত আছে তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কাহারও প্রাণে ব্যাথা দিবার জন্য এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান সমাজের খাঁটি চিত্র দেখাইয়া সমাজপতিগণের মনোযোগ আকর্ষণই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে—সমাজে সাড়া পরিয়াছে।

নারী পতিতা হইলে তাহার নাকি কোন মূল্যই থাকে না। তাহাকে অপমান করিলেও আইন অনুসারে "মান হানীর" দাবী চলে না. কিন্তু "পতিত" পুরুষের বেলায় এই আইনই কার্য্যকারী —কারণ, আইন প্রণেতা পুরুষ। আমার উকিল বলেন—আইনের এই ত্রুটির জন্যই, সুরুচী পতিতা নহে—এই মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে। কংগ্রেস কাউন্সিলে যাঁহারা নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবী করেন তাঁহারা কি আইন সভায় ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইতে পারেন না? প্রকাশ্যে পতিতা-দের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে নিন্দার কোন নূতন কারণ উপস্থিত হইবে না। কারণ কংগ্রেস ও কাউন্সিলের এই সকল মার্কামারা সদস্যদিগকে দেশের লোক ভাল করিয়াই জানে।

যদি আগামী কংগ্রেস ও কাউন্সিলে আমাদের এই দাবী কেহ উপস্থিত না করেন তবে মনে করিব যাহারা সমানাধিকারের জন্য চিৎকার করেন তাঁহারা নিছক মিথ্যাবাদী। হয় আমাদের দাবী পূরণ কর—না হয় 'পতিত' দিগকে ও কংগ্রেস কাউন্সিল অথবা অন্য কোন কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য আইন কর।

প্রকাশক মহাশয়ের চিঠিতে জানিলাম—এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য বহু অনুষন্ধিৎসু নাকি বিশেষ উৎসুক। আমি পাপ জীবন পরিত্যাগের কল্পনা করিয়া কিছুদিন যাবৎ কাশি বাস করিতেছি, আরও কয়েকটী তীর্থক্ষেত্র দর্শনের পর অল্পকালের জন্য কলিকাতায় ফিরিব। এখানে পতিতারূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে আমি ইচ্ছুক নহি; যদি কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রকাশকের ঠিকানায় আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিলে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

ভদ্র মহিলা কেন পতিতা হয় তাহার ধারাবাহিক কারণ ইতিহাস লেখা এক প্রকার অসম্ভব, কিন্তু এই প্রকার ক[...] পতিতার পতনের নিগূঢ় কারণ জানিতে পারিলে তাহার মূল সূত্র পাওয়া যাইতে পারে এবং ইহার প্রতিকারেরও উপায় হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমি একুশটী পতিতা ভদ্র মহিলার উক্তি হইতে তাঁহাদের জীবনী লিখিয়াছি, আরও কয়েকটী লিখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতিকৃতি ও সহ শীঘ্রই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

বাঙ্গালী টোলা।
বেণারস

বিনিতা—
গ্রন্থ কর্ত্রী

শিক্ষিতা

পতিতার আত্মচরিত

প্রথম

বাল্যে

১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে আমি জন্ম গ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তিনি, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব, সন্তান-সন্ততি এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অনেকেই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন। সমাজে তাঁহাদের মান মর্য্যাদা কম নহে। আমার এই আত্ম-চরিত হয়ত তাঁহাদের হাতে পরিতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে বিব্রত করিতে চাহি না।

আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ী এবং নগরেরর উপকণ্ঠে একখানা বাগান বাড়ী ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমার পিতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে, বাহিরেও তিনি মাঝে মাঝে যাইতেন।

আইন কলেজে পড়িবার সময় আমার পিতার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আমার পিতামহ জীবিত। আমার মাতুল পরিবারও কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহারা বিশেষ অর্থশালী ছিলেন

না—কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় উচ্চ এবং রূপে অতুলনীয় সুন্দরী বলিয়া আমার মাতাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য পিতামহ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। আমার জন্মের দুইবৎসর পর আমার পিতামহের মৃত্যু হয়।—ঠাকুর দাদার কোলের সুখলাভ যে আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল—কেবল মাত্র কল্পনাতেই সেই স্মৃতি জাগিয়া আছে।

কন্যা বলিয়া আমি শিশুকালে অনাদৃত হই নাই। পিতার বন্ধুগণ কেহ কেহ বলিলেন, "প্রথম কন্যাসন্তান, সৌভাগ্যের লক্ষণ"। কথাটা হাস্য পরিহাসের সহিত বলা হইলেও, তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে বোধ হইল। আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্ব্বে পিতা আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার উন্নতি হ গেল। কিছুকাল মধ্যেই আমার পিতা কোন সুযোগে বার্ষিক হাজার টাকা আয়ের একটা ছোট জমিদারী নীলামে ক্রয় করিলে।

শৈশব অবস্থায় আমার শরীর রুগ্ন ছিল। মা আমাকে লই সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতেন। পিতামহ আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি নাকি আমার দি চাহিতে চাহিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। আজ মনে হয়, সেই ঋষিতু বৃদ্ধ বুঝি তাঁহার শেষ নিশ্বাস আমার প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে তাই আমি মরিতে মরিতেও বার বার বাঁচিয়া উঠিতেছি।

আমার যখন তিন বৎসর বয়স, তখন একবার কঠিন জ্ব আক্রান্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার কবিরাং আমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ সে আমার চিকিৎসায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া ছিলেন।

মা নিত্য শিবপূজা করিতেন। একদিন দুশ্চিন্তার উদ্বেগে নিতান্ত কাতর চিত্তে তিনি পূজার ঘরে অচেতন হইয়া পরেন। জ্ঞান সঞ্চার হইলে মা বলিলেন, "খুকুমণি সেরে উঠ্‌বে, আর কোন ভয় নেই।" তিনি অন্তরে অন্তরে তাঁহার অভীষ্ট দেবের নিকট হইতে কোন আশ্বাস পাইয়াছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু তার পর হইতে বাস্তবিক আমার দেহ একপ্রকার ঔষধাদি ব্যতীতই নীরোগ হইতে লাগিল। চারি মাসের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম।

একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আমার দেহকান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার পরিপুষ্ট অবয়ব—উজ্জ্বল মুখ-শ্রী—দীর্ঘ নিবিড় কুন্তলশোভা—আনন্দোৎফুল্ল চলন ভঙ্গী দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমি পূর্ব্বে ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলাম; কিন্তু এই রোগভোগের পর আমি কিছু চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলাম। বিস্কুট লজেঞ্জুস কিনিবার জন্য মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড় রাস্তার উপরে মনোহারী দোকানে ছুটিয়া যাইতাম—ঘুড়ী ধরিবার জন্য আমাদের বাড়ীর প্রশস্ত ছাদে দৌড়াদৌড়ি করিতাম—অস্পৃশ্য পরিয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল না। ঝির সঙ্গে কখনও ক[illegible]ও তাহাদের বাড়ীতে চলিয়া যাইতাম। চাকরেরা আমার [illegible]গামীতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। বাবার বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া [illegible]মি গোলযোগ আরম্ভ করিতাম। বাড়ীতে আর ছোট ছেলে [illegible]য় কেহই ছিল না। একমাত্র আমার চীৎকার ও হাস্য কলরবে [illegible]বড় বাড়ীখানি সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। বাবার নিকট আমার [illegible]ন বেলার এই সকল কথা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতাম।

স্নান করা আমার অতি আনন্দের বিষয় ছিল। মায়ের অনুরোধে বাবা আমার জন্য বাড়ীর উঠানে একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। তার মধ্যস্থলে সুন্দর ফোয়ারায় জল উঠিত। ছয় সাত বৎসর বয়সে আমি সাঁতার শিখিয়াছিলাম। স্নান করিবার সময় আমার সমবয়সী প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া আনিতাম। আমরা সকলে চেঁচামেচি ছুটোপাটি করিয়া সেই বৃহৎ চৌবাচ্চার জলে হাঁসের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় মত্ত থাকিতাম। মা আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন, সেই জন্য বাবা আর কিছু বলিতেন না।

আমার আর একটী অভ্যাস ছিল—প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই। যে দিন বাবা বাহিরে যাইতেন না, সেদিন আমি মায়ের সঙ্গে মোটরে চড়িয়া যাইতাম। আমার এক মামাত ভাই আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাঁহার নাম ছিল নন্দলাল, তাঁহাকে আমি নন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতাম। [illegible]হার [illegible] কখনও কখনও হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তার দুইধারে সুন্দর সুন্দর সাজান দোকানপাট, ট্রামগাড়ী, আলোকমালা, অসংখ্য লোক চলাচল, এসব দেখিয়া আমার মনে কি আনন্দ হইত! আলিপুরের চিড়িয়াখানা, চৌরঙ্গীর যাদুঘর, হাবড়ার পুল, [illegible]শ-নাথের বাগান, কালীঘাটের মন্দির এসকল আমি বালিকা [illegible] অনেকবার দেখিয়াছি।

পুতুলখেলা অপেক্ষা পাখী পুষিবার সখই আমার ছিল [illegible] পায়রা, ময়না, টীয়াপাখী, কাকাতুয়া, হীরেমন, শালিক প্র[illegible] নানাপ্রকার সুন্দর পাখী বাবা আমাকে আনিয়া দিতেন।

National Library

বিড়াল আমি ভাল বাসিতাম না। ফুলগাছেও আমার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাখীর নেশা আমার কমিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার এক মৃত সন্তান প্রসবের সময় আমার মায়ের মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলাম। মৃত্যু কি, তাহা তখন আমি বুঝিতাম। আমাকে কেহ মিথ্যা বাক্যে ভুলাইতে পারিল না—কেহ আমাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। আমি চীৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিলাম। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু আমি ছিন্ন-শির ছাগশিশুর মত ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বাবার কোল হইতে নামিলাম। প্রতিবেশীগণ মায়ের মৃত দেহ পালঙ্কের উপর পুষ্প-মালায় সাজাইয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। আমি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। আমার মনে আছে, কতকদূর যাইয়া ফুটপাতের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি, বাহকেরা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পালঙ্কের চাদ্দিকে মায়ের আল্‌তা মাখান পা-দুখানি বাহির হইয়া রহিয়াছে; তাহাই আমার দৃষ্টি পথে।

আজ আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়া চক্ষুর জল ঝরিতেছে। কতদিন কতদুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি—মনে হইয়াছে, তাহা মায়ের সেই চরণযুগলে নিপতিত হইয়া শুষ্ক অলক্তক-রাগকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুতে বাবা খুব কাঁদিয়াছিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত কিছু আহার করেন নাই। অবশেষে বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবার শয়নগৃহের প্রাচীরে মায়ের একখানি বৃহৎ সিপিয়া রংএর ব্রোমাইড এনলার্জ্জমেণ্ট ছবি ছিল। আমার সপ্তম জন্মতিথিতে বাবা আমাকে উহা উপহার দিয়াছিলেন। সাড়ে সাত শত টাকা ব্যয়ে তিনি ঐ ছবিখানি বিলাত হইতে তৈয়ারী করাইয়া আনেন। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা নিত্য এক ছড়া ফুলের মালা দিয়া ছবিখানিকে সাজাইতেন।

মায়ের জীবদ্দশাতেই আমি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। বাড়ীতে একজন গৃহ শিক্ষক আমাকে ও নন্দ দাদাকে পড়াইতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। বাড়ীতে অধিক সময় পড়াইবার জন্য একজন ভাল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া শোকাবেগ কতকটা প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয় বাবা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যাহা হউক ইহাতে আমার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হইল না।

ছয় মাস চলিয়া গেল। তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনে অব্যবহিত পরেই বোমার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। নেতাদে নির্ব্বাসন, যুবকদের কারাদণ্ড, বিপ্লব-বাদীদের গ্রেপ্তার, বো ওয়ালাদের ফাঁসী, এই সকল ভীষণ ব্যাপারে দেশময় এ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। নানাস্থানে সভা সমিতি, লাঠিখে আখড়া প্রভৃতি স্থাপিত হইল। আমার পিতা এই আন্দো মধ্যে ছিলেন। নন্দ দাদা আমাকে মাঝে মাঝে স্বদেশী লইয়া যাইতেন। সেখানে কত উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনিতা

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বেশ গান গাহিতে পারিতাম। স্বাভাবিক শক্তিতেই আমার সুর তাল জ্ঞান ছিল, কণ্ঠস্বরও নাকি আমার সুমিষ্ট—যাঁহারা আমার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই প্রশংসা করিতেন। সঙ্গীতের ক্ষমতা আমার কিরূপে জন্মিল, আমি বুঝিতে পারি না। আমার পিতামাতা কেহই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। বাবা আমাকে একটী খুব ভাল টেবিল হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছিলেন। এক জন শিক্ষক আমাকে এস্রাজ বাজ্‌না ও গান শিখাইতেন।

একদিন দেখিলাম নন্দ দাদা দুইখানি লম্বা ছোরা কিনিয়া আনিয়াছে। আমার সম্মুখে টেবিলের উপর ছোরা দুইখানি রাখিয়া বলিল "মানি, তোকে ছোরা খেলা শিখ্‌তে হবে।" আমি একখানি ছোরা হাতে লইয়া বলিলাম, "সে কি নন্দ দা?" নন্দদা আর একখানি ছোরার বাঁট ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করিল। অপর হস্তে আমার ডান হাতের কব্জি ধরিয়া এমন ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল, যেন সে এখনই আমাকে মারিতে উদ্যত। আমিও বাঁ হাতে নন্দদা'র ডান হাতের কব্জি ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল "এই ত ঠিক, এম্‌নি করেই ত আট্‌কাতে হয়।" আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এক স্বদেশী সভায় ছেলেদের ছোরা খেলা দেখিয়াছিলাম, আমি বলিলাম "মেয়েদের এসব শিখে কি হবে?" নন্দলাল বলিল "কেনরে মানী, শুনিস্ নি সেই গান,—"আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধরগো?"

আমি বলিলাম "হাঁ,—মনে আছে।" এই বলিয়া আমি

তখনি টেবিল হারমোনিয়মের সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। তাহার ঢাক্‌না খুলিয়া চাবি টিপিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিলাম,—

আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধরগো,—
পরিহরি চারু কনক ভূষণ গৈরিক বসন পরগো
আমরা তোর কোটী কুসন্তান,
ভুলিয়া গিয়াছি আত্ম বলিদান,
করে মা পিশাচে তোদের অপমান প্রতিকার তার করগো।

গান শেষ হইলে বাবা আসিয়া বলিলেন "কিরে, খুকু—তোদের কি হচ্ছে?" নন্দ দা মুহূর্ত্তের মধ্যে ছোরা দুখানি লইয়া আর এক দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। আজও আমার সে দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে।

সে দিন বাবা আমাকে এক স্বদেশী সভায় লইয়া গেলেন। এই গানটী আমি সেই সভাস্থলে গাহিলাম। সকলে আমার খুব প্রশংসা করিল। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভার সভা-পতি ছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই—উহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। ঐ সভাতে বাবা এক বক্তৃতা দিলেন।

তখন দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান সহর ও তাহার নিকটবর্ত্তী বহুদূরব্যাপী স্থানসমূহের গৃহস্থগণ আশ্রয়হীন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। দেশের সহৃদয় জনসাধারণ তাহাতে অর্থদান করেন। অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার থিয়েটার সিনেমায় বেনিফিট্‌ নাইট অর্থাৎ সাহায্য রজনী ও অপর নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে আমার বাবা আমাকে কয়েকবার থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। নন্দ দাদাও সঙ্গে যায়। থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গীত ও অভিনয় দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মনে আছে, আমি প্রথম নাটক অভিনয় দেখি—দেবী চৌধুরাণী ও আলিবাবা। দেবী চৌধুরাণীর 'বীণা—বাজেনা কেন' এবং আলিবাবার 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' এই দুইটী গান আমি এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছিলাম যে আমার পিতা অনেকবার বাড়ীতে আমার মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। রবিবারে বায়স্কোপ যাওয়া আমার ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া উঠিল। কখনও নন্দ দাদা,—কখনও বা বাবা নিজে আমার সঙ্গে যাইতেন। কোন কোন রবিবারে আমি বাবার সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতিতে তিনি ব্রাহ্মদের মত উদার-ভাবাপন্ন ছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর হইতে বাবা প্রতিদিন মায়ের ছবিতে একটী ফুলের মালা দিতেন।

এখন আর মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া হয় না। বহুদিন যাবৎ একছড়া বেলফুলের মালা উহাতে শুকাইয়া ছিল, একদিন চাকর দেওয়াল ঝাড় দিতে উহা ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের কাহারও মনেই তাহাতে কোন চঞ্চলতা বা বিরক্তি আসে নাই। সকালে ছয়টা হইতে নয়টা,—অপরাহ্ন একটা হইতে চারিটা মাষ্টার মহাশয় পড়াইতেন। শনিবারে কখনও কখনও থিয়েটারে, রবিবারে বায়স্কোপে যাওয়া আমার নিয়মিত কার্য্য মধ্যে ছিল।

নন্দ দাদার চেষ্টায় ছোরা খেলা শিখিয়াছিলাম।—আমার ডান হাতে একটা বড় কাটার দাগ এখনও তার সাক্ষী। বাবার আদেশে ছোরা খেলা পরিত্যাগ করি। তার পরিবর্ত্তে গল্পের পুস্তক পড়ায় আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয় ইহাতে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

'দেবী চৌধুরাণী' নাটক অভিনয় দেখিবার পর আমি বোধ হয় 'ভ্রমর' ও 'কপাল কুণ্ডলা' দেখিয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন, বঙ্কিম বাবুর লেখা আসল বই না পড়্‌লে, রস ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় না। আমাদের বাড়ীতে তিনটী আলমারী বোঝাই অনেক পুস্তক ছিল। মাষ্টার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্য হইতে বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া দিলেন। আমি দিবারাত্রি সেই উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিলাম। সকল স্থানে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তথাপি প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইত।

আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জেষ্ঠ্যা ভগিনী। আমার যাহাতে কোন কিছুর অসুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন আমি শুনিলাম, পিসিমা বাবাকে বলিতেছেন "হাঁরে খোকা, এইত একবৎসর প্রায় হ'য়ে এল। আর ত দেরী করা ভাল নয়। তোর শাস্ত্রজ্ঞান আছে—বংশ রক্ষা, পিতৃকুলের জলপিণ্ড, এসব কি তুই জানিস্ না।" আমি তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

কিছুদিন পরে বাবা আমাকে পুনরায় বেথুনস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া

দিলেন। আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। আমি স্কুলের গাড়ীতেই যাতায়াত করিতাম। কারণ—বাবা বলিলেন, তাঁহাকে এখন প্রায়ই মোটরে বাহিরে যাইতে হয়, সুতরাং আমাকে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাইতে ও স্কুল হইতে লইয়া আসিতে নিজেদের মোটর সকল সময় পাওয়া যাইবে না। গৃহ শিক্ষক মহাশয় সকালে ও সন্ধ্যায় দুবেলা আমাকে পড়াইতেন।

যতদিন মা বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাইয়াছি। মায়ের মৃত্যুর পর অমি বাবার ঘরে পৃথক বিছানায় শুইতাম। একদিন বাবা আমাকে বলিলেন, "খুকু—তুমি তোমার পিসিমার কাছে ঘুমিও"। আমি কখনও পিতার অবাধ্য হই নাই। আর একদিন বাবা চাকরকে ডাকিয়া দেওয়ালে মায়ের ছবিখানা দেখাইয়া বলিলেন, "এই বড় ছবিখানা খুকুর পড়্‌বার ঘরে টানিয়ে দিস্ ত।" আমার জন্য দুইটি নূতন বড় বুক্‌কেস্, একখানা বড় মেহগিনি কাঠের সুন্দর টেবিল ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহা আমার পড়িবার ঘরে সাজান হইল। মেজেতে পাতিবার জন্য সুন্দর কার্পেট আসিল। একটা কাট্‌গ্লাসের খুব দামী দোয়াতদানী ও একটী ওয়াটারম্যানের ফাউণ্টেন পেন বাবা আমাকে দিলেন। গ্রীষ্মকাল পড়িয়া ছিল আমার পড়িবার ঘরের বিজলী পাখায় নূতন রং করা হইল। আরও চারিখানা সুন্দর বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপ ছবির সঙ্গে মায়ের ছবিখানাও সেই ঘরে শোভা পাইল। মাস্টার মহাশয় আমার পড়িবার ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমি স্কুলের পড়ায়, নভেলে, থিয়েটার ও সিনেমার আমোদে নিমগ্ন।

এমন সময়ে এক বসন্ত প্রভাতে আমদের গৃহদ্বারে নহবতে

সুমধুর রৌসনচৌকী বাজিয়া উঠিল। প্রতিবেশী বন্ধুগণ ও আত্মীয় স্বজন আনন্দ কোলাহলে মত্ত। পিসিমা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। পিতাকে নব বরবেশে সজ্জিত দেখিলাম। পুষ্পপত্রে শোভিত চতুর্দ্দোল আসিয়াছে। শুভ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। আমিও উৎসবে মাতিলাম। আমার পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ মায়ের সেই ছবিখানির দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি মুহুর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম; আমার চক্ষে জল আসিল। তার পর আমি ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইলাম। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল—দেখিলাম বিমাতা আসিয়াছেন।

দ্বিতীয়

কৈশোরে

ক্রমশঃ উৎসবের কোলাহল থামিল। দিন দিন আমিও প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। পিসিমার থাকিবার আর প্রয়োজন রহিল না। নব বধূকে সংসার ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া তিনি ছয় সাত মাস পরে চলিয়া গেলেন। আমি তখন হইতে পিসিমার ঘরে একাকিনী শয়ন করিতাম।

বিমাতা বয়সে আমার অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ছিলেন। আমার দেহের গঠন পরিপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হওয়ায় আমাকেই বড় দেখাইত। তিনি সুন্দরী ছিলেন—গৃহকার্য্য ও লেখাপড়া সামান্য-রূপ জানিতেন। তাঁহার সহিত আমার বনিবনাও না হইবার কোন কারণ ছিল না, কারণ আমি অধিকাংশ সময় আমার পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতাম।

বাবা অন্তঃপুরে আসিলে, বিমাতা প্রায়ই কোন কার্য্য ছলে তাঁহার কাছে থাকিতেন। বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত পিতার সহিত এখন আমার সাক্ষাৎ হইত না। পূর্ব্বে তিনি আমাকে স্কুলের পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—কাছে বসিয়া আমার গান শুনিতেন, এখন আর তাহা নাই। বাবা যেদিন বিমাতাকে লইয়া থিয়েটারে যাইতেন, আমাকে নিতেন না, সে-দিন নন্দদাদার সঙ্গে আমি বায়স্কোপে যাইতাম।

কি কারণে জানি না, আমার পুরাতন গৃহ শিক্ষককে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাবা আমাকে বলিলেন "তুমি এখন উপরের ক্লাসে পড়্‌ছ, পুরাণো মাষ্টারের বিদ্যা ত বেশী নয়; আজ কালকার স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচিত লোক না হলে চলেনা।" কয়েকদিন পরে আমার জন্য নূতন মাষ্টার আসিলেন। ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে আসিলেন, সেইদিনই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে আমি একটু আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার লম্বা লম্বা চুল কপাল হইতে উল্‌টা দিকে আঁচড়ান এবং ঘাড়ের কাছে ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া বাবড়ী পাকান—তাঁহার বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ—দাড়ী গোঁপ উঠে নাই—না পরিস্কার কামানো তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কাপড় ঢিলা মালকোঁচা দিয়ে পরিয়াছেন, মনে হয় যেন কাবুলীদের পা-জামা। গায়ে একটা পরিষ্কার ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী জামা—তখনও খদ্দরের চলন হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসিকা—চোখ দুটী সুন্দর—কিন্তু একজোড়া সোণার ফ্রেমে বাঁধান চশমা সেই সৌন্দর্য্যকে অন্য রূপ দিয়াছে। পায়ে নকল জরীর কাজ করা নাগরা জুতা। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম—দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তাঁহার কথায় যেন বাঁশী বাজে। তিনি সম্প্রতি বি, এ, পাশ করিয়া কোন স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় অবিবাহিত।

তাঁহার নিকট আমার পড়াশুনা ভালই হইতে লাগিল। তিনি গণিত শাস্ত্র বিশেষ জানিতেন না—তবে সাহিত্য ইতিহাস বিশেষতঃ কাব্য তিনি অতি চমৎকার পড়াইতেন। সকালে বিকালে

দুইবেলাই তিনি আসিতেন। আমি চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম।

নন্দদাদা আমার দুই ক্লাশ উপরে পড়িত। এবার তার এণ্টান্স্ ক্লাসে উঠিবার কথা। কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ না থাকায় সে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীতেই রহিয়া গেল। নন্দ দাদা ও আমি একই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পড়িতাম।

দুই চারি দিনের পরিচয়ের পর একদিন মাষ্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন "মানু, তুমি আমাকে 'মাষ্টার মশাই' বলোনা— এ ডাকটা আমি ভারী অপছন্দ করি। তুমি আমাকে আমার নাম ধরে' ডাক্‌তে পার।" আমি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলাম— আপনি যেমন 'মশাই' কথাটা পছন্দ করেন না—আমিও তেমনি নামের শেষে 'বাবু' যোগ করা ভালবাসিনা। দেখেন নি—আজকাল 'বাবু' উঠে গিয়ে 'শ্রীযুতের' প্রচলন হয়েছে ?"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ, তুমি আমাকে "মুকুল দাদা" বলে ডাক্‌তে পার। তুমি ত জান আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়।" এইরূপে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল। আমি সেইদিন হইতে তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করি।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "খুকু, তোমার মাষ্টার মহাশয়ের সকালে বিকালে চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। ওঁর চায়ের ব্যবস্থাটা এখানেই করে' দিও। তাহ'লে তিনি আরও একটু আগে আস্‌তে পারেন।"

আমাদের বাড়ীতে দু'বেলাই চা তৈ'রী হইত। পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে বসিয়া চা খাওয়া আমার নিয়ম ছিল। আজকাল বাবার চায়ের পেয়ালা বিমাতা হাতে করিয়া নিতেন। বাবাও আমাকে কখন ডাকেন নাই। আমি আর সেদিকে যাইতাম না। আমি মাষ্টার মহাশয় আসিবার পূর্ব্বেই আমার পড়িবার ঘরে একলা বসিয়া চা খাওয়া শেষ করিতাম।

এখন মাষ্টার মহাশয় আমার চা পানের সঙ্গী হইলেন। সেই সময় আমাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতিক নানা কথাবার্ত্তা হইত। তখন দেশ-নেতাদের মহলে 'আত্মশক্তির' কথা উঠিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "মানু, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা সুখদুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।' অন্নবস্ত্র ত দূরের কথা. সামান্য বিষয়ের জন্যও আমাদিগকে পরের উপর নির্ভর করতে হয়। এই দেখনা কেন, চাকর চা তৈয়ারী করিয়া না দিলে আমাদের চা খাওয়া হয়না; অথচ ইহা দুই মিনিটের কাজ। আমাদের সমাজে ও পরিবারে বিলাসিতা এত বেড়ে উঠেছে।"

বাবাকে বলিয়া আমি একটী ছোট ইলেক্‌ট্রীক হিটার কিনিলাম। আমার পড়িবার ঘরে বিজ্‌লী বাতির লাইনে প্লাগ ছিল। তাহার সাহায্যে আমি সহজে জল গরম করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পরদিন মাষ্টার মহাশয় আসিলে যখন স্বহস্তে চা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার সম্মুখে পেয়ালা ও প্লেট ধরিলাম, তখন তিনি আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিলেন "বাঃ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়্‌লে উপদেশের বীজ এমনি ফলপ্রদ বৃক্ষে পরিণত হয়।"

আমি তখন লক্ষ্য করি নাই, আমার ঐ সোনার চুড়ী-পরা হাতখানির ছায়া পেয়ালার মধ্যস্থিত তপ্ত তরল পদার্থে পড়িবার পূর্ব্বে মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

পূজার সময় হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ। বাবা বিমাতাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ ছিলনা। আমার যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাবাকে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ, আমাকে সঙ্গে নেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রায় নয়, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। বিদেশে যাইয়া পিতা অথবা বিমাতা কেহই আমার নিকট চিঠিপত্র লেখেন নাই। পিসিমা আসিয়া বাড়ীতে ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দুই একখানি চিঠি পাইতেন—আর টাকা পাঠাইবার জন্য সরকার মহাশয়ের নিকট চিঠি আসিত।

একদিন নন্দ দাদা আমাকে বলিল "মানী, আজ মিনার্ভা থিয়েটারে যাবে?—চল—শিরীফরহাদ্‌প্লে—খুব সুন্দর অপেরা। একেবারে অফুরন্ত নাচগান। সে একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইল। পিসিমার কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন "তোরা দু'জন ত ছেলে মানুষ, মাষ্টার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হয়।" বলা ... মাষ্টার মহাশয় আপত্তি করিলেন না।

আমরা তিনজনে একটা বক্স রিজার্ভ করিয়া বসিয়াছিলাম। ...নয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বিশেষতঃ নৃত্যগীত আমাকে ...ায় প্রীত করিয়াছিল। মাষ্টার মহাশয় প্রতিদৃশ্যের ঘটনাবলী ...রত্র সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফর্‌হাদের

অপূর্ব্ব প্রেম ও শিশরীর আত্মবিসর্জ্জন আমার হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। আমি অনুভব করিলাম, আমার বুকের মধ্যে যেন কোন সুষুপ্ত পশুর ঘুম ভাঙ্গিতেছে।

মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে ও সিনেমায় যাইতেন। তিনি না গেলে আমার আমোদ উপভোগ সম্পূর্ণ হইত না। কারণ তিনি সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। যে দিন বিল্বমঙ্গল শঙ্করাচার্য্য কিম্বা ধর্ম্মমূলক অভিনয় হইত, সে দিন পিসিমাও আমাদের সঙ্গে যাইতেন। ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের নাটকগুলি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

আমার পিতা তখনও বিদেশে। আমি জ্বরে শয্যাগত। পিসিমা চিন্তাকুল। মাষ্টার মহাশয় দিবারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া আমার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, পথ্য তৈয়ারী, আমার কাছে বসা, প্রায় সমস্ত কাজ মাষ্টার মহাশয় করিতেন। তাঁহার স্কুল কামাই হইতে লাগিল। বেদনায় অস্থির হইলে তিনি আমার গা টিপিয়া দিতেন—মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতেন; আঙ্গুর বেদানা নাসপাতি একটু একটু করিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিতেন। পিসিমা ইহাতে একটু আশ্বস্ত হইতেন।

যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমি যখন মা—মা বলিয়া কাঁ[illegible] তখন আমি লক্ষ্য করিয়াছি, মাষ্টার মহাশয় আমার সমবেদনা[illegible] জল ফেলিয়াছেন। তিনি জানিতেন আমি মাতৃহীনা—[illegible] অনাদৃতা কন্যা। একমাস পরে একটু সুস্থ হইয়া আমি ক্ষী[illegible] বলিলাম "মুকুলদা, আপনিই আমাকে এবার বাঁচিয়েছেন।"

মহাশয় বলিলেন "মানু, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।" আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া আবেগে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিলাম—মুকুলদা আপনার স্নেহের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।"

সেই হইতে অন্যের অসাক্ষাতে মাষ্টার মহাশয়কে 'তুমি' সম্বোধন আরম্ভ। আমাদের হৃদয় যেন পরস্পর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইল। একদিন তিনি একখানি সুন্দর বাঁধান ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক আমার হাতে দিয়া বলিলেল "মানু, আমার 'ঝরণা' ছাপা হয়েছে। তোমার সেবা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাহাকে চিরস্মরণীয় কর্‌বার জন্য আমার এই প্রথম গীতিকাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করেছি।" আমি ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুস্তকখানি লইয়া বলিলাম "মুকুলদা তুমি তোমার কবিতা ছাপাতে দিয়েছ, একথাত আমাকে কখনো বলনি! মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "ঐটী অপরাধ হয়েছে।"

আমাকে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার সময় মাষ্টার মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সমুহ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়া দিতেন। তিনি যে কবি ও ভাবুক তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। 'ঝরণার' অ[illegible] কবিতা আমার সম্মুখেই লেখা হইয়াছিল। আজ পুস্তক [illegible]রে গ্রথিত হওয়াতে উহার মধ্যে যেন নূতন ভাব দেখিতে [illegible]াম।

[illegible]ল্লি, আগ্‌রা, মথুরা, বৃন্দাবন, বোম্বাই, লাহোর, প্রয়াগ, কাশী, [illegible] স্থানে ভ্রমণ করিয়া বাবা পাঁচ মাস পরে কলিকাতায় [illegible]ইকোর্ট্‌ খুলিবার পরেও দুইমাস তাঁহার কামাই [illegible]তী ব্যবসায় করিবার আর তেমন ইচ্ছা তাঁহার

ছিলনা। এখন তিনি নিজের বিষয় কর্ম্ম দেখিতে অধিক ম-
দিলেন।

আমার এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা চাকুরীর চেষ্টায় এক-দিন আমাদের বাড়ীতে পিতার নিকট আসেন। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে মানু কেমন আছিস্—কোন্ ক্লাসে পড়িস্? কে তোকে বাড়ীতে পড়াচ্ছে", আমি বলিলাম—"এখন বেথুনে সেকেণ্ড্ ক্লাসে পড়্ছি। মুকুল বাবু আমার প্রাইভেট্ টিউটার।"

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "ও—আমাদের ঝরণার কবি মুকুল বাঁড়ুয্যে?—সে যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে পড়েছি।" সন্ধ্যা বেলায় মাষ্টার মহাশয় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "কি ভাই মুকুল, শুনলুম তুমি মান্দাকে পড়াচ্ছ—বেশ। তারপর—কাব্য চর্চ্চা ছাড়া আর কি কাজ কর্ম্ম হচ্ছে?"

মাষ্টার মহাশয় তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথা বার্ত্তা কহিলেন। আমাকে বলিলেন "রমেশ বাবু যে তোমাদের ...ীয় একথাত মানু তুমি কখনও আমায় বলনি।" আমি ব...
"আমিত জানিতাম না। বাবা সেদিন এঁর পরিচয় দি...
রমেশ দাদা বলিলেন "আমি প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে ...
এবাড়ীতে এসেছিলাম। তখন মানদার বয়স ৩।৪ ...
তখন আমি সবে মাত্র এন্ট্রান্স্ দিয়েছি; স্বদেশী ...
হ'ল, পড়াশুনা ছেড়ে কয়েক বৎসর খুব হৈ চৈ ক...

আবার কলেজে ভর্ত্তি হলুম। গত বৎসর এম্ এ পাশ করে এতদিনত বসে আছি।”

আমার পিতার চেষ্টায় রমেশ দাদার একটা ভাল চাকুরী হইল—কোন লিমিটেড কোম্পানীর অফিসের বড় বাবু, বেতন মাসিক দুইশত টাকা। তিনি প্রথম প্রায় একমাস আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরে কোন বোর্ডিংএ একটা ভাল কামরা ভাড়া করিয়া থাকিলেন। বাবার নিকট বলিলেন “হাতে কিছু টাকা জমাইয়া বাড়ী ভাড়া করিব—তখন মা স্ত্রী ও ছোট ভাই বোনদের এখানে লইয়া আসিব।” সেই বৎসরই রমেশ দাদার বিবাহ হইয়াছিল।

পিসিমা চলিয়া গিয়াছেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বামুন ঠাকুরই রান্না করিত। দুইটী ঝি ও তিনটী চাকর আমাদের বাড়ীতে ছিল। দেহ-সুখের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অভাব আমার হয় নাই। সুস্বাদু খাদ্য পানীয়—বিচিত্র বসন ভূষণ প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। আমার পড়িবার ঘর ও শয়ন গৃহের সজ্জা অতুলনীয়, আরামের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। তথাপি আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটিত না। পিতার অনাদর ও অবজ্ঞা এই ... ক নিত্য সতেজ রাখিত। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় যখন ...ম, কুলী মুজুরেরা তাহাদের ছেলেমেয়েকে কোলে লইয়া ...রিতেছে, তখন আমি আমার সকল ঐশ্বর্য্যকে মনে মনে ...তাম। আমি বুঝিয়া ছিলাম, দৈহিক অভাব মোচনই ... —অন্নবস্ত্র প্রদানই আদর নহে—আদর প্রাণের জিনিস— ... উহা স্পর্শ করে—ভাবেই উহার প্রকাশ।

আমার ত্রয়োদশ জন্মতিথির পূর্ব্ব দিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "খুকু, তোমার মাষ্টার মহাশয় ও রমেশদাকে নিমন্ত্রণ করো।" জন্মদিনের উৎসব করিতে আমার আর ভাল লাগিত না। তথাপি কোন প্রকারে দিনটা চলিয়া গেল। বিমাতা আমাকে একছড়া সোণার হার উপহার দিলেন। রমেশ দাদার নিকট হইতে একটা রূপার সুদৃশ্য পাউডার কৌটা উপহার আসিল। মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় দিয়াছিলেন একখানা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী।

আমি ছোটগল্প ও কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলাম। রমেশ দাদা তাহা পড়িয়া খুব প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন "মুকুলকে দিয়ে মাসিক কাগজে এগুলো ছাপিয়ে দাও।—এ ত বেশ সুন্দর হয়েছে। আজকাল মেয়েদের কি সব রাবিশ লেখা বের হয়!"

আজকাল রমেশ দাদাও আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে যাইতেন। নন্দদাদা এখন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় মাতিয়া ছিল, সে আর বড় একটা যাইত না। বিশেষতঃ সে বেচারা নাটকের সাহিত্যের দিকটা কিছুই বুঝিত না এবং অভিনয়ের মধ্যে যে আর্ট আছে, তাহা ও তার উপলব্ধি হইত না। ষ্টেজের উপরে যুদ্ধ বিগ্রহ, নাচগান—সাজ পোষাক এসব জমকালো রকমের হইলেই সে খুসী হইত।

তখন থিয়েটারে একটা পরিবর্ত্তন আসিতে ছিল। [illegible] সম্প্রদায়ের ভদ্র যুবকেরা থিয়েটারে যোগ দিয়া তাহা[illegible] শিল্প কলার বিকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। রমে[illegible] মুকুলদা এই অভিনব আর্টিষ্টদের মর্য্যাদা বুঝিতেন এবং [illegible] খুব প্রশংসা করিতেন। রমেশদার নিকট অনেক [illegible] অভিনেত্রীদের নাম ও পরিচয় আমি জানিলাম। এমন বি[illegible]

ভিতরের জীবন কাহিনীও তিনি আমাকে কিছু কিছু শুনাইলেন—যাহা মুকুলদার ও অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার দুই বৎসর পরে আমার পিতার একটী পুত্র সন্তান হয়। ইতিমধ্যে তিনি ওকালতী ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বৈমাত্রেয় ভাইটীকে আমি অতিশয় স্নেহ করিতাম ; কিন্তু তাহার জন্য পৃথক আয়া ও দাসী নিযুক্ত হওয়ায় আমি তাহাকে সর্ব্বদা কোলে নিতে পারিতাম না। সন্তান প্রসবের পর বিমাতার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাবা তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইলেন। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ নিত্য আসিতে লাগিল। আট নয় মাস পরে বিমাতা একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা দূর হইল না।

আমার পিতার কোন কোন বন্ধু এবং আমার পিসিমা অনেকবার বাবার নিকট আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমার কাণে তাহা আসিয়াছে। বাবা বলিলেন, এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিব না। ম্যাট্রিক পাশ করুক। তার পর দেখা যাবে। পিসিমা ও পিতার বন্ধুগণ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আজকাল খবরের কাগজে এ বিষয়ে নানা বাদ প্রতিবাদ ও তর্কবিতর্ক আপনারা পাঠ করিয়া থাকেন।

(আমার যৌবনোদ্ভব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতায় ও অনুকূল পবনে যথাসময়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বিবাহের জন্য মনে মনে আমার আকাঙ্ক্ষাও হইত।)

তৃতীয়

পলায়ন

বেথুনে পড়িবার সময় আমার দুই তিনটী অন্তরঙ্গ বালিকা বন্ধু লাভ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে কমলার পরিচয় একটু বিশেষভাবে দিব। কারণ তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। বাল্যকালের কোনবন্ধুর সহিত এখন আর দেখা হয় না। অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু কমলাকে এখন ভুলিতে পারি নাই। সেও আমাকে হয়ত ভুলে নাই। আজ এই আত্মচরিত লিখিবার সময়ে তাহার কথা প্রতিমুহুর্ত্তে আমার মনে হয়—অতীত জীবনের সুখ দুঃখের কত কথা আজ মনে হইতেছে।

কমলা পরমা সুন্দরী ছিল—ছিল কেন, এখনও বোধ হয় আছে নারীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পুরুষেরা বলিয়া থাকে,—"স্ত্রীলোক কুড়ি পার হইলেই বুড়ি।" একথা সকলের সম্বন্ধে খাটেনা। (কুড়ির পর আরও কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু এমন নারী হিন্দুসমাজে যথেষ্ট আছে, যাহাদের সৌন্দর্য্য ভাদ্রের ভরানদীর মত ঢল ঢল শরতের জ্যোৎস্নার ন্যায় অনাবিল, তাহাতে মলিনতার লেশমাত্র নাই।) আমি নিজে নারী হইয়া নারীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছি শুনিয়া হয়ত আপনারা হাসিবেন।

শুধু রূপে নহে, গুণেও কমলা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ও সহানুভূতি আমি চিরদিন সমভাবে পাইয়াছি। আমোদ প্রমোদে, গান বাজনায়, হাস্ত পরিহাসে, খেলা ধুলায়, লেখা পড়ায় সকল বিষয়ে তাহার সমান অধিকার ছিল। স্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসান (পুরস্কার বিতরণ) অথবা অন্য কোন উৎসবের আয়োজনে কমলার সাহায্য না হইলে চলিত না। সে মেয়েদের গান ও অভিনয় শিখাইত।

একবার কোন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টায় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমার রমেশদা তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে বোধহয় বেথুন, ডায়োসিসান, প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মিলিয়া নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র কাব্য হইতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। তাহাতে আমি শৈলজার অংশ লইয়াছিলাম, কমলা নিজে জরুৎকার সাজিয়াছিল। আমাদের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শৈলজার দু'টী গান আমার মাষ্টার মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কমলা তাহাতে সুর যোজনা করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিল। অর্জ্জুনের প্রেমলাভে নিরাশ শৈলজার অন্তরের ব্যথা সেই গানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। সেই গান এখনও মাঝে মাঝে গাহিয়া আমি শান্তি পাই।

কমলা বৈদ্য বংশের মেয়ে। কলিকাতায় বাগ্‌বাজারে একখানা সাধারণ দোতালা বাড়ীতে সে তাহার মাতার সহিত বাস করিত। কমলার পিতা কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। মাঝে

মাঝে দুই এক মাস বা দশ পনরদিন কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন। কমলার একটী ছোট ভাই স্কুলে পড়িত। সে কমলার অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিল।

বাড়ীখানা কমলাদের নিজের। সুতরাং তাহার পিতা মাসিক যে দুইশত টাকা পাইতেন, তাহাতে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ স্বচ্ছন্দে হইয়া যাইত।

আমি কমলাদের বাড়ী অনেকবার গিয়াছি। তাহার মাতা অতি শান্ত-স্বভাবা ও স্নেহশীলা। তিনি আমাকে আদরের সহিত কত সুমিষ্ট খাদ্য আহার করাইতেন। আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলাম বলিয়া সহজেই কমলার মায়ের বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িলাম। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন "তুমি আমার কমলার ছোটবোন।" কমলা বয়সে আমার দুই বৎসরের বড় ছিল।

কাশীতে কমলার পিতার এক বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় এক যুবকের সহিত কমলার বিবাহ হয়। উহা দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। কমলা তখন আমাদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। যুবকটী কাশীতেই চাক্‌রী করিত—তাহার পিতামাতাও সেখানে থাকিতেন। গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটিতে কমলা কাশীতে স্বামীর কাছে যাইত। কমলা ও তাহার স্বামীর মধ্যে যে সকল চিঠিপত্র চলিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি দেখিয়াছি। আমরা দুইজনে গোপনে বসিয়া তাহাদের কত অর্থ বিশ্লেষণ করিতাম।

আমাদের সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে এই সব চিঠি লইয়া হাস্য পরিহাস চলিত। আমার আরও দুই তিনটী বিবাহিত বন্ধু ছিলেন। তাহাদের স্বামী-প্রেমের ভিতরের রহস্যও আমি

জানিতাম। প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ, বাসর রজনী যাপন, মান অভিমানের অভিনয়, পুরুষের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় লইয়া আমাদের মেয়ে মহলে নিত্য আলোচনা হইত। এই সকলের মধ্যে আমি আমার ছোট গল্পের প্লট্ ও কবিতার উপাদান পাইতাম। তাই কুলদা আমাকে বলিতেন "মানু, তোমার গল্পে ও কবিতায় আমি রিয়্যালিষ্টিক আর্টের গন্ধ পাচ্ছি।"

প্রায় আট নয় মাস হইল, কমলার সহিত তাহার স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বড় ভয়ানক। কমলার শ্বশুর কিরূপে শুনিয়াছেন, কমলার মাতা কমলার পিতার বিবাহিতা পত্নী নহে—রক্ষিতা মাত্র। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া পতিতা নারীর কন্যাকে তিনি পুত্রবধূ রূপে গৃহে রাখিতে পারেন না। তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন—কমলাকে আর তিনি গ্রহণ করিবেন না—পুত্রের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেন। তিনি আরও ভয় দেখাইয়াছেন, যদি কমলা ভরণ পোষণের দাবী করে, তবে আদালতে তিনি সমস্ত কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন, এবং প্রতারণার অভিযোগ করিয়া কমলার পিতার বিরুদ্ধে পাল্‌টা মোকদ্দমা আনিবেন।

এই ব্যাপার উপলক্ষে কমলার স্বামী যে কয়েকখানা পত্র তাহার নিকট লিখিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। তিনি কমলাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কমলাও তাহার স্বামীর প্রতি বিশেষ [illegible] ছিল। কে যেন দারুণ খড়্গাঘাতে ইহাদের প্রেমের বন্ধন [illegible] দিল। কমলার স্বামী লিখিয়াছেন—"কি করব—[illegible] অপরাধ নেই জানি কিন্তু আমি পিতার অবাধ্য [illegible]নে। আমায় ক্ষমা কর কমল। ধর্ম্মসাক্ষী করে

তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলাম—আবার ধর্ম্মের মুখ চেয়েই তোমায় পরিত্যাগ করছি। অগ্নি পরীক্ষার পরও রামচন্দ্র কলঙ্কিত পত্নীকে নিয়ে গৃহধর্ম্ম পালন করতে পারেন নি। সীতার মত পত্নীকে বিসর্জ্জন করতে হয়েছিল। এখন বিদায়, আমার ভালবাসা তুমি চিরদিন পাবে—কিন্তু পত্নীরূপে নহে।”

এই পত্রের উত্তর আমিই কমলাকে লিখিয়া দিয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দেওয়া কমলার ইচ্ছা ছিল না। তার প্রাণে কঃ আঘাত লাগিয়াছিল। বাহিরের আমোদ প্রমোদে সে তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিত কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতাম আমার অনুরোধে ও উপদেশে কমলা শেষে এইরূপ লিখিল—

“তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করেছ, তাহা অটল থাকুক। তোমা পিতৃভক্তি যেন বিচলিত না হয়। তুমি ভারতের আদর্শ গৌরব দেখিয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছ, তাহার শেষ চিত্র তোমা চোখে পড়েনি। পরশুরামের প্রায়শ্চিত্ত—ভীষ্মের শরশয্যা— রামচন্দ্রের বিলাপ তুমি ভুলে গিয়েছ। পিতৃভক্ত মাতৃঘাতী কুঠার হস্ত-মুক্ত করবার জন্য পরশুরামকে দীর্ঘকাল তীর্থ ভ্রমণ করতে হয়েছিল, পিতৃভক্তি তাকে রক্ষা করতে পারেনি প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা অম্বার তপস্যা ভীষ্মের ক্ষাত্রশক্তিকে নপুংসকের হস্তে পরাভূত করেছিল, পিতৃভক্তি তাহাকে রক্ষা করতে পারেনি এ জগতে প্রত্যেক কর্ম্মের ফল পৃথক পৃথক ও স্বাধীন।”

“একের দ্বারা অন্যের প্রতিরোধ হয় না। উপদেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। প্র করো। তুমি মহৎ—তাই আমায় পরিত্যাগ ক

ভালবাসবে বলছ, কিন্তু আমি তোমার মত মহৎ নই—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম, জানিনা কোথায়।"

কমলার এই পত্রেরও উত্তর আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার স্বামী লিখিয়াছিলেন "কমল আমার অপরাধ বুঝেছি। প্রায়শ্চিত্তের দিন এলে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করব। তখন যেখানেই থাক হতভাগ্যকে একবার মনে করো।" বুঝিলাম কমলার স্বামীর প্রাণ আছে। সে যথার্থ দরদী, কিন্তু অবস্থার দাস। সমাজের কৃত্রিমতার আঘাতে এমন কত হৃদয় স্বভাবের পথে পরিচালিত হইতে পারে না। সমাজ-বিধি এমনি করিয়া মানব জীবনের পরিস্ফূর্ত্তির পথে অন্তরায় হয়।

কমলার মায়ের সম্বন্ধে যে কলঙ্কের কথা রটিয়াছিল, তাহ কতদূর সত্য আমি তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদ্মফুলের মূ থাকে কাদায়—সূর্য্য তাহার খোঁজ রাখে না। সে উপরে ফুলটীকে ফুটাইয়া সুখী হয়—বাতাস তাহাকে দোলায়—মর তার মধুপান করে।

কমলা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিত। আমার পিতা হাকে স্নেহ করিতেন। মাষ্টার মহাশয়, আমি, কমলা ও রমেশ মাঝে মাঝে মোটরে বেড়াইতে যাইতাম। কমলাদের বাড়ীতে দের চা-পার্টির নিমন্ত্রণ হইত। কমলার মাতা ধনীর গৃহিনী লেও আমাদের আদর যত্নের ত্রুটী হইত না। তিনি স্বহস্তে খাবার প্রস্তুত করিতেন।

আমি যে সকলের সঙ্গে এরূপ অবাধ মেলা মেশা করিতাম

ইহাতে পিতার কোন আপত্তি ছিলনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সামাজিক ব্যাপারে উদার মত পোষণ করিতেন। আমাদের বাড়ী পশ্চাতে খানিকটা মাঠের মত জায়গা ছিল। আমি বাবাকে বলিয় সেখানে একটী টেনিস্ কোর্ট তৈয়ারী করাইলাম। নন্দ দা এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইল ; রমেশ দা, মুকুলদা, কমলা, আমি নন্দলাল এবং আরও কয়েক জন বন্ধু বৈকালে এই মাঠে টেনি খেলিতাম। মুকুলদা খেলা কিছুই জানিতেন না—তাঁহাকে অনে ধরিয়া বাঁধিয়া শিখাইয়া লইলাম। কমলা খেলায় খুব নিপ ছিল। সে সর্ব্বদাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিত। রমেশদ মুকুলদা কখনও আমার পক্ষে কখনও কমলার পক্ষে খেলা করিত

বিমাতা আমাদের সংসারে আসিবার সময় পিত্রালয় হইতে একটী দাসী আনিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল হরিমতি তাহাকে ঝিয়ের কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে হইত না। সে ছি অনেকটা আমার বিমাতার পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট বা প্রাইভে সেক্রেটারী। তাহার বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ হইবে। বোধ হ সে বিধবা—থান কাপড় পড়িত, হাতে নোয়া ও সিঁথিতে সিঁ দিত না, তাহার গলায় একছড়া সরু বিছাহার ও হাতে চারি সোণার চূড়ি ছিল। সে একাদশীর উপবাস করিত, মাথায় তেল মাখিত ও চব্বিশ ঘণ্টা দোক্তা দেওয়া পান চিবাইত। বেচারাদের উপর যে তার কটাক্ষপাত না হইত এমন নহে।

বাড়ীর এক নিভৃত কোণে হরিমতি তাহার শোবার ঘ করিয়াছিল। উহা সে প্রয়োজন মত সাবধানে তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখিত। দুপুর বেলা সে ঐ ঘরে যাইয়া ঘুমাইত

নিজের কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ না থাকায় অপর সকলের কাজের উপর ওস্তাদি করিয়া বেড়াইত—আর খামাকা কথা তুলিয়া কেবলি গোলযোগ পাকাইত।

আমার এই রকম চালচলন হরিমতি দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে প্রথমে বিমাতার নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। কিন্তু বিমাতা আমার প্রায় সম-বয়সী, বিশেষতঃ মায়ের মত গাম্ভীর্য্য ও শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি রুক্ষভাষিণী ও কোপন স্বভাব নহেন। সুতরাং তিনি আমায় কিছুই বলিলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া হরিমতি বাবার কাছে গেল; কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হইল না।

অবশেষে সে নিজেই আমাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল। একদিন হরিমতি আমাকে বলিল "আচ্ছা, খুকুমণি এসব কি বলত! পাড়াময় লোকে ছিছি কচ্ছে। জ্ঞাতি ভাই আছে—মাষ্টার আছে, বেশ তাদের সঙ্গে ভব্য সভ্য হয়ে কথা কও—হাস্তে হাস্তে পুরুষের গায়ে ঢলে পড়া—গলাগলি হ'য়ে বেড়ান! তুমি সোমত্ত মেয়ে—বিয়ে হ'লে এদ্দিনে ছেলের মা হ'তে।"

হরিমতি যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়, এজন্য আমি কোন উত্তর দিলাম না। মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। ঝগড়া করা আমার স্বভাব নহে। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে বাদ প্রতিবাদ আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, তাহা আমি জানিতাম। ঘটনা যে পাড়াময় ছড়াইয়াছে, একথা হরিমতি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল। তবে ইহাও আমি জানিতাম, যদি আমার কখনও বদনাম রটে, তবে তাহা হরিমতি দ্বারাই হইবে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ধারণা সত্যে পরিণত হইল। হরিপ্রতি যখন দেখিল মুখের কথায় শাসাইয়া আমাকে জব্দ করিতে পারিল না, তখন সে পাড়াময় আমার বদ্‌নাম রটাইতে লাগিল। কথা ক্রমশঃ বাবার কাণে উঠিল, তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি সংবাদ-দাতাকে বলিলেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিলে অমনি সাধারণ লোক নানা মিথ্যা কলঙ্কের কথা রটায়। কারণ—এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা চলিত নহে।"

আমার জেদ বাড়িয়া উঠিল। মুকুল দাদা আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "প্রেমের পথে যতই বাধা বিঘ্ন আসে, ততই উহা প্রবল হয়।" ইহার প্রমাণ আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে পাইতে লাগিলাম।

আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে দেখিলাম দুইটী যুবক—মুকুল ও রমেশ। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল বেগে ছুটিল। আমাকে টানিয়া রাখিবার জন্য শাসন মাতৃস্নেহ, আদর যত্ন ছিল না। আজ মনে হয়, আমার মা বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এপথে আসিতাম না। আমার বাবা যদি একদিনও একটু আদর করে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন, অথবা শাসন করিতেন তবে বোধ হয় এ জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত।

মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশদা ছিল সাহসী ও বেপরোয়া। একদিন দুপুর বেলা বাবা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। আমাদের স্কুল ছুটি। আফিসও বন্ধ। রমেশদা আসিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকাবাবু, মানী কোথা?"

বাবা বলিলেন উপরে আছে—কেন ?" রমেশদা বলিলেন "আজ আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, মানী যদি যায়, তবে কাকীমাকে শুদ্ধ নিয়ে যাব।" বাবা বলিলেন "যাও জিজ্ঞেস্ করে এস।"

রমেশ-দা একবারে আমার শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় গীতগোবিন্দের একটা কবিতা পড়িতেছিলাম। তিনি পালঙ্কের উপরে আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মানী আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে? —চল।" আমি বলিলাম, "না রমেশদা, আজ শরীরটা ভাল নয়।" রমেশদা আমার কপালে হাত দিয়া কহিলেন "কৈ, কিছুইত নয়! দেখি হাত!" তিনি আমার বাঁম হাত খানি টানিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন "কিছুনা—তোমার সব চালাকী! তিনি আমার আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার আঙ্গুলগুলি প্রবেশ করাইয়া পাঞ্জা ধরার মত আমার হাত টিপিতে লাগিলেন। আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইতেছিল।

আমি কাত হইয়া ফিরিয়া শুইলাম। একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলাম, "নাড়ী টিপিয়া আর কপালে হাত দিয়াই বুঝি সব ব্যারাম ধরা যায়।" রমেশ-দা এই পরিহাসের অর্থ বুঝিয়া বলিলেন "তবে আমাকে বিনা ষ্টেথিস্‌কোপেই পরীক্ষা কর্‌তে হয়।" আমি অস্ফুট স্বরে কহিলাম—"ও কি ভাই।"

কিছুক্ষণ পরে রমেশ-দা বাহির হইয়া গেলেন। হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন রক্তের স্বাদে উন্মত্ত হয়, আমিও তেমনি হইলাম।

আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা অনুতাপ আসিল না। বরং আশঙ্কা ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। বুঝিলাম ইচ্ছা থাকিলে সুযোগের অভাব হয় না।

ছয় সাত মাস চলিয়া যায়। আমি প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন দিতেছি। রমেশ-দা তখনও বোর্ডিংএ থাকেন। নানা অছিলা দেখাইয়া পরিবার আনেন নাই। মুকুলদা কমলার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম মতে কমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত, এইরূপ ভাবও দেখাইয়াছেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। কমলা কিন্তু তখনও দূরে দূরে—সে তার পূর্ব্বের স্বামীকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই।

একদিন রমেশ-দা আমার নিকট প্রস্তাব করিল, আর ত এ বাড়ীতে হ'তে পারে না। এমন স্থানে চল, যেখানে নিত্য তোমায় দেখ্‌ব—প্রতিমুহূর্ত্তে তোমায় প্রাণের কাছে রাখ্‌তে পারব। পাথরের পাহাড় চুরমার করে যখন নদীপ্রবাহ একবার বেরিয়েছে, তখন চল একবারে মুক্তপ্রান্তরে যেয়ে পরি। আমি কোন উত্তর না দিয়া রমেশ-দার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। বাড়ীতে সকালবেলা অধিকক্ষণ পড়িবার জন্য আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম যে এখন স্কুলের গাড়ী প্রথম ট্রিপেই নয়টার সময় আমাকে নিতে আসে; অথচ ক্লাস বসে সাড়ে দশটায়। বহু সময় আমার বৃথা নষ্ট হয়। বাবা বলিলেন, "বাড়ীর মোটরত মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না আসে ততদিন ট্যাক্সি করে যেও।

নন্দলাল আর তুমি এক সঙ্গে যাবে। আগে তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর নন্দকে দিয়ে আস্‌বে। পরদিন হইতে আমি ও নন্দ-দা টাক্সিতে স্কুলে যাইতাম। আসিবার সময় নন্দলাল আগে টাক্সি করিয়া আসিত। আমি তাহার জন্য স্কুলে অপেক্ষা করিতাম।

দুই তিন দিন যাবৎ আমার মাঝে মাঝে বমি হইতেছে। মুখ দিয়া কেবল থুতু উঠে। রমেশদা শুনিয়া একটু স্তব্ধ হইলেন। পরদিন তিনি আসিয়া বলিলেন "মানী, আমি চার মাসের ছুটী নিয়েছি। চল পশ্চিমে যাই। আর বেশী দেরী করোনা। কাল স্কুলে যাবার সময় নন্দকে আগে নামিয়ে দিয়ে তুমি ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে আমার বাসায় যেও। আমি সব জিনিষ পত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখ্‌ব। যা যা কেনবার প্রয়োজন, মুকুলকে টাকা দিয়েছি।" আমার প্রাণ আনন্দে অধীর হইল।

মুকুলদা নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিতেন। আমার সহিত রমেশ-দার প্রণয়ের কথা মুকুলদার নিকট গোপন ছিল না। এই উপলক্ষে তাঁর কত নূতন কবিতা রচিত হইয়া গেল—'মাধুরী' নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখা হইল।

পরদিন যথাসময়ে আমি ও নন্দ-দা ট্যাক্সি চড়িয়া স্কুলে রওয়ানা হইলাম। আমি পুস্তক অথবা খাতা কিছুই নিলাম না। নন্দদাকে বুঝাইলাম, "এখন পরীক্ষার জন্য আমাদের পুরানো পড়া রিভাইজ্‌ হচ্ছে, বই নিয়ে কি হবে!" গাড়ীতে উঠিয়া নন্দ-দা তাহার রিষ্ট্‌ ওয়াচের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঃ—মানু আমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে।" আমি বলিলাম "তাহলে নন্দদা, তুমি আগে নেমে যাও,

আমার একটু পরে গেলেও ক্ষতি নাই!” এমনি করিয়াই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়া জোটে। আমি ভাবিতেছিলাম নন্দদাকে কি বলিয়া আগে নামাইবার ব্যবস্থা করি। সাধুর সৎ-কার্য্যের বুদ্ধি যিনি প্রেরণ করেন, চোরের মাথায় ফিকির ফন্দিও তিনিই যোগান।

নন্দ-দাকে তাহার স্কুলে নামাইয়া দিয়া আমি একেবারে সোজা-সুজি রমেশদার বাসায় উপস্থিত। দেখিলাম, সেখানে মুকুল-দাও রয়েছেন। রমেশ-দা একটা সুট্‌কেশ লইয়া আমার সহিত অন্য এক ট্যাক্সিতে উঠিলেন। মুকুল-দার নিকটে এইখানেই বিদায় নিলাম। তাড়াতাড়িতে কমলাকে কিছুই জানান হয় নাই। মুকুল-দাকে বলিলাম, তিনি যেন কমলাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলেন। ট্যাক্সী হাওড়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, মুকুল-দা রুমালে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে একবার মনে হইয়াছিল, যাইবার সময় মায়ের ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া যাইব। কিন্তু মানসিক উদ্বেগে সে কথা ভুলিয়া গেলাম। ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ মায়ের ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বোধ হয়, এতবড় জঘন্য দুঃসাহসের কার্য্য করিতে পারিতাম না।

আমরা একটা লোক্যাল ট্রেণে বর্দ্ধমান যাইয়া কিছুক্ষণ থামিলাম। তার পর সন্ধ্যায় লাহোর এক্‌স্‌প্রেসে একেবারে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চতুর্থ

ভুল ভাঙ্গিল

আমি ঘর ছাড়িলাম কেন ?—এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্ট-ভাবেই দিব : প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। শরীর-ধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বয়সে আমাদের যৌবন চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে আছে। বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষায় নিরত এবং সর্ব্বদা সৎসঙ্গে রাখিলে এই যৌবন চাঞ্চল্য অল্প বয়সে আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গেরই অভাব। তাহার ফলে তরুণ হৃদয়ে অকালে যৌবন সম্মেলনের উদ্দাম কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমি সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উত্তেজনায় দুস্প্রবৃত্তিই সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্ম্মভাবের উদয় হয় এমন কোন পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই। আমোদ প্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহা সমস্তই অতি নিম্ন স্তরের। থিয়েটারে নাচ গান, সিনেমার চিত্র কখনও হৃদয়ে সদ্ভাব

জাগ্রত করে নাই। অল্প বয়স্কদের পক্ষে তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা বিপদ্‌জনক। দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিঁধিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়; থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণ তরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি। আমার মত যাহারা আছে তাহারাও ইহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই আমার মনে হইয়াছিল আমি খুব জানি। তরুণ সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাস যথেষ্ট পড়িয়াছিলাম; বিশেষতঃ মুকুলদার অনুগ্রহে সেলী, বায়রণ, সেক্সপীয়ার, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তক ও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সুতরাং অহঙ্কার যে আমাকে ফুলাইয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

যাহারা কেবল কল্পনাময় রাজ্যে বিচরণ করে, সংসারের কঠোর সত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞান জন্মে না। কবি ও সাহিত্যিকেরা এই রকম ধরণের লোক। তাঁহারা শুধু চিন্তা লইয়া খেলা করেন, কর্ম্মের ধারেও ঘেঁসেন না। মুকুলদার শিক্ষায় আমার এই দশা হইয়াছিল। কাব্য কবিতা ও নাটক নভেলের মধ্য দিয়া সংসারকে কল্পনার চক্ষে যেমন দেখিয়াছি, প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম সে সমস্তই মিথ্যা।

আমি যখন গৃহত্যাগ করি তখন আমার বয়স পনর বৎসর। এই বয়সে যদি আমি আমাকে নিঃসহায় ও বুদ্ধিহীনা মনে করিতাম,

যদি ভাবিতাম যে আমি ত সংসারের কিছুই জানিনা—যদি আমার পদে পদে ভয় হইত, তবে আমি কখনই এমনভাবে বাহির হইতাম না। কিন্তু একটা মিথ্যা গর্ব্ব আমাকে দুঃসাহসী ও দূরদৃষ্টিহীন করিয়া তুলিল। আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের অধীন থাকিতাম, তবে আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যেও পরাধীনতার প্রয়োজন আছে, তাহা এখন বুঝিয়াছি।

ভাবিয়াছিলাম, ঘরের বাহির হইলেই বুঝি সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে—প্রবৃত্তির ভোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে পারিব। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর। পুলিশের ভয়—আমাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। বিদেশে, লোকজন সমস্তই অচেনা, আমরা বাঙ্গালী কোথায় যাই কোথায় থাকি, কি খাই। রমেশ-দা বাহিরে গেলে আমি একাকী কিরূপে ঘরে থাকিব? নানারকম সমস্যা—বহুপ্রকারের অসুবিধা। বাড়ীতে যে ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। সেখানেত আরও স্বাধীন ছিলাম—এমন কি রমেশ-দার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের সুযোগও ছিল বেশী।

অবশ্য টাকার জোরে সকল অসুবিধাই অতিক্রম করা যায়। কিন্তু রমেশদার কি এত টাকা আছে। আমি ত প্রায় এক বস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছি। রমেশ-দা আড়াই হাজার টাকা সঙ্গে আনিয়াছেন। বসিয়া বসিয়া খাইলে ইহাতে কতদিন চলিবে? পশ্চিম ভারতের যে কোন সহরেই থাকি, খুব উঁচু ষ্টাইলে ভাল হোটেলে থাকিতে হইবে। আমার কাপড় চোপড় ও কিছু গহনাপত্র চাই। একটা ছোক্‌রা চাকরের দরকার। আমরা শাকভাত, ডাল্‌রুটী খাইয়া সন্ন্যাসীর মত গাছ তলায় থাকিতে নিশ্চয়ই আসি নাই।

আমাদের জীবনে ভোগের পূজা, তাহার প্রধান উপকরণ কাঞ্চন।

দিল্লীতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মুকুলদার পত্রে জানিলাম বাবা আমার জন্য খুব অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু পুলিশে এজেহার দেন নাই। রমেশদার উপর ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে। তাঁহার আফিসে ও বাড়ীতে খবর লওয়া হইতেছে। কমলা অতিশয় দুঃখিত। দিল্লী হইতে আমরা লাহোরে গেলাম।

রমেশ-দা পূরা এক বৎসরও চাকুরী করেন নাই। এরই মধ্যে তিনি কিরূপে চারিমাসের ছুটী পাইলেন, একথা কখনও আমার মনে হয় নাই।

কতদিন কাজ করিলে কতদিন ছুটী মিলে—কোন্ আফিসের কি রকম দস্তুর, ইহার খোঁজ খবর কাব্য উপন্যাসে পাওয়া যায় না। আমি ভাবিয়াছিলাম আফিসের কেরাণীরা চাহিলেই ছুটী পায়।

আমরা রেলপথে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করি। বর্দ্ধমানে গাড়ীতে উঠিয়া রমেশ-দা সুটকেস্ খুলিলেন। আমার সম্মুখে পাঁচ তাড়া নোট্ রাখিয়া বলিলেন "মানু, এই আমাদের সম্বল"। আমি গুণিয়া দেখিলাম প্রত্যেক তাড়ায় ১০০ খানি পাঁচ টাকার নোট্। এই আড়াই হাজার টাকা রমেশ-দা কোথায় পাইলেন তখন ভাবি নাই। মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে এক বৎসরের বেতনও আড়াই হাজার হয় না। রমেশ-দা বোধ হয় বড়লোকের ছেলে—বাপের টাকা উড়াইতেছেন। তাওত নয়। আমার পিতার কাছে রমেশ-দা চাকুরী প্রার্থী হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে মাসাবধি তিনি আমাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এত কথা তখন আমার মনে আসে নাই। কারণ ভোগলালসা যা'র সৃষ্টি, সেই সয়তান সমস্ত ভুলাইয়া রাখে। সুখের স্বপ্নে বিভোর গন্ধর্ব্ব দম্পতী অথবা কিন্নর মিথুনের মত আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়াছি—মাটীতে আর পা পড়িতেছে না।

লাহোর হইতে আমরা অমৃতসরে যাই। সেখানে তিনদিন থাকিয়া কাশ্মীর যাত্রা করি। শ্রীনগরে আমরা প্রায় একমাস থাকি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোরম তাহা সকলেই জানেন। আমাদের নূতন প্রেমের বন্যা এখানে খুব উছলিয়া উঠিল।

বোম্বাই আসিলাম। আমার ভয় ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। প্রথমে যে সকল বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা দূর হইল। পুলিশের ভয় নাই। রমেশ-দা খুব চতুর ও হুসিয়ার লোক। যদিও মুকুলদার চিঠিতে জানিয়াছিলাম, বাবা পুলিশে এজেহার দেন নাই, তথাপি তিনি যেখানেই যাইতেন, সেইখানে প্রথম থানার পুলিশ কর্ম্মচারীদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কোন গন্ধ পাইলে সময় থাকিতে সরিয়া পড়িবেন, এই তাঁহার মতলব ছিল।

স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়িতেই আমি ইংরাজীতে বেশ কথা কহিতে পারিতাম। মুকুলদার শিক্ষায় ও রমেশদার সঙ্গে থাকিয়া এই বিষয়ে আমার আরও উন্নতি হইয়াছিল।

হোটেলে আমরা সাহেবী ষ্টাইলে থাকিতাম। আমি পার্শী মেয়েদের ধরণে কাপড় পরিতাম। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিতে আমার ইংরাজী কথা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বিদেশের

খাওয়া দাওয়া, চাল-চলন আমি অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিয়া লইলাম। প্রথম প্রথম আমি এসব লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পরিয়াছিলাম। রমেশদা আমাকে বলেন "তাঁরে মানু, তোরা বাংলা দেশের মেয়ে যদি পাঞ্জাবে এসে মনে করিস্, ওরে বাবা—এ কোথায় এলাম—বোম্বাইয়ের লোক যদি বাংলায় যেয়ে খাওয়া দাওয়া চলাফেরা নিয়ে মুস্কিলে পরে, মাদ্রাজীরা যদি অযোধ্যাকে ভাবে বিদেশ, তবে বল দেখি সমগ্র ভারতে জাতীয়তা গড়ে উঠ্‌বে কি করে?"

আমি বলিলাম, "ভারতবর্ষ এক বৃহৎ দেশ, এর মধ্যে ভাষার, ধর্ম্মের, সামাজিক রীতিনীতির এত বৈচিত্র, ও বৈষম্য যে এখানে একাজতি গড়ে উঠা অসম্ভব মনে হয়।" রমেশ-দা জোরের সহিত বলেন "এই অসম্ভবকেই সম্ভব কর্‌তে হবে।" রমেশদার এই একটা গুণ দেখিয়াছি তিনি যেখানেই গিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত পরিচিত স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন—শুধু চিন্তায় নহে, কার্য্যেও।

দিল্লী, লাহোর, শ্রীনগর, বোম্বাই এই সকল সহরে থাকিবার সময় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও তীর্থস্থান সমূহ দর্শন করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার মানসিক বিকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। চঞ্চলতার পা বর্ত্তে হৃদয়ে শান্তভাব আসিল। বিমর্ষতার স্থলে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। রমেশদা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্রীনগর হইতে বোম্বাই যাইবার পথে আমরা দ্বারকা ও রাজপুতনা হইয়া গিয়াছিলাম। পুষ্কর, ভরতপুর, জয়পুর, চিতোর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত ভাবের

উদয় হইল। আমি বাড়ীর কথা, বাবার কথা সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। একবার বাবার সঙ্গে এদিকে বেড়াইতে আসিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বিমাতার পক্ষপাতী হইয়া আমাকে লইয়া আসেন নাই। আজ রমেশদার অনুগ্রহে আমার সেই সাধ পূর্ণ হইল। আমি হাঁটিবার সময় রমেশদার হাত ধরিয়া চলিতাম—মোটরে চড়িয়া যাইবার সময় রমেশদার গলা জড়াইয়া বসিতাম। পশ্চিম ভারতের সেই উচু নীচু রাস্তায় মোটরে চলিবার সময় স্প্রাং এর মৃদু দোলায় নাচিয়া নাচিয়া আমাদের পরস্পর আনন্দিত বক্ষে কি পুলকের তরঙ্গ উঠিত! রমেশদার প্রতি শুধু প্রেমে নহে—কৃতজ্ঞতায়ও আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

হলদিঘাট দেখাইয়া রমেশ-দা বলিলেন "এই আমাদের ভারতের থার্ম্মোপলি—যেখানে পনর হাজার রাজপুত দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। এ বীরত্ব গে রব আজ আমরা ভুলে গেছি। রমেশদা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িলেন। আমি ডি, এল, রায়ের রাণা-প্রতাপ নাটকের অভিন য় দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম "এমন কঠোর ব্রত—এমন তীব্র বৈরাগ্য—স্বদেশের দাসত্ব মোচনের জন্য এমন অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ আর কে করতে পারে? এতবড় উচ্চ আদর্শ আমাদের কল্পনায়ও আসেনা।"

পদ্মিনীর জহর ব্রতের স্থান দেখিলাম। দর্শনার্থিরা সকলে প্রণাম করিতেছে। তাহাদের দেখাদেখি আমিও মাথা নোয়াইলাম, আমার বুক কাঁপিতেছিল। হাত দুখানি অবশ হইয়া আসিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম। পার্শ্বে দণ্ডায়মান রমেশদাকে ধরিয়া বলিলাম, "চল এখান থেকে যাই।"

সেই সতীরাণী স্বর্গ হইতে আমায় কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন জানিনা। আজ মনে হয়, যদি ভারতে পদ্মিনীর মত সতীর আদর্শ না থাকিত, তবে মানব সমাজের পথ প্রদর্শক এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসিয়া পড়িত। পুরাণে শুনিয়াছি, দক্ষযজ্ঞে এক সতীর অনল প্রবেশ—আর এই দেখিলাম আর বহু সতীর আত্মত্যাগের মহিমা-ময় তীর্থক্ষেত্র। বুঝিলাম, জহর ব্রতের তিমির গহ্বরের অগ্নিশিখা পদ্মিনীর দেহ দগ্ধ করে নাই, পাপীর ভোগ লালসাকেই পুড়িয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা বোম্বাই নগরীর অন্তর্গত মালবার শৈল পল্লীতে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলাম। ট্যাক্সী বিদায় দিয়া আমরা ধীরে ধীরে পদব্রজে চলিতেছিলাম, সেদিন আমার মন বড় খারাপ ছিল। কেন, তাহা পরে বলিতেছি। দুপুরবেলা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। রমেশ-দা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই। আমার বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। চারি-দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা আসিল। রমেশদা বলিলেন "হাঁরে মানু, তোর এই মলিনমুখ দেখবার জন্যই কি ঘর বাড়ী পরিবার পরিজন ছেড়ে এসেছি? ব্যাপার কি বল্ দেখি?" এই বলিয়া তিনি আমাকে বাঁ হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব একবার ঝাঁকিয়া দিলেন। আমি তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল। তিনি আমার চিবুক ধরিয়া আমার দিকে চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে আমার ছল ছল চক্ষুতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আমার চক্ষের জলবিন্দু মুছাইয়া দিলেন। এসেন্সের মৃদু সুবাস আমাকে পুলকিত করিয়া চারিধারে ছড়াইল। আমরা নিকটবর্ত্তী একখানা বেঞ্চির উপরে বসিলাম।

তিনি বলিলেন "মনু, তোমার জন্য সমস্ত ছাড়িয়া আসিলাম। নিজের স্ত্রী, বিধবা মা, ছোট ভাইবোন সকলের কথা আজ তোমারই জন্য ভুলেছি। শেষে তুমিও আমায় পরিত্যাগ করবে? তোমায় নিয়ে কি বিপদের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তা দেখেই বুঝতে পার তোমায় কত ভালভাসি!" রমেশ-দা আবার আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। আজ আমার এ সকল আদর সোহাগ যেন ভাল লাগিতেছিল না। সম্মুখের অস্পষ্ট অন্ধকারের দিকে আমি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার হাত দুখানি কোলের উপরে অঞ্জলি-বদ্ধ ছিল। রমেশ-দা আমার ডান হাতখানি তুলিয়া তাঁহার নিজের কাঁধের উপর নিয়া রাখিলেন। আমি রমেশদাকে অনাদর করিয়াছি ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত পথ দিয়া শৈলবিহারী সৌখীন লোকদের দুই একখানি মোটর গাড়ী মাঝে মাঝে মৃদুশব্দে চলিয়া যাইতেছে। রমেশদা বলিলেন "চুপ করে আছিস্ কেন—কি হয়েছে?" আমি বলিলাম, "না কিছু হয়নি। আজ কমলার চিঠি এসেছে, তুমি ত দেখেছ"। আমি ডানহাত দিয়া ভাল করিয়া রমেশদার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

একটা সিগারেট্ ধরাইতে ধরাইতে তিনি বলিলেন "ওঃ—বাড়ীর কথা মনে পড়েছে বুঝি—আরে তুই একেবারে কচি খুকিটি।" একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা মানু,

বাড়ীতে তোমার কি আকর্ষণ আছে বল দেখি?—মনে কিছু ক'রোনা। আমি স্বরূপ কথাই বল্‌ছি। তোমার মা নাই,—ভাই বোন নাই। পিতা দ্বিতীয় পক্ষের ষোড়শী পত্নীকে নিয়ে আমোদ করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ের দিকে ফিরেও চান্‌না। শোবার ঘর থকে কৌশল করে তোমায় সরিয়েছেন—তোমার মায়ের ছবি-খানিকেও দূর করে দিয়েছেন। সেখানে তোমার কি সুখ আছে বলত?"

আজ রমেশ-দা অমন কথা বলিলে তার উত্তর আমি অন্যরূপ দিতাম। কিন্তু তখন আমি ভাবিয়াছিলাম "সত্যই রমেশদা, আমি মরুভূমি থেকে ছুটে এসে শীতল জলধারার সন্ধান পেয়েছি—আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমার জন্য কি ছেড়ে এসেছ, তা দেখ্‌বার আমার প্রয়োজন নাই—আমার সম্মুখে তুমি যে প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছ, আমি শুধু তাই দেখ্‌ছি।"

সেই স্থান হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আমরা সিনেমায় গেলাম। আমার হৃদয়ের প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। আমি মনে করিলাম, কেন বৃথা দুশ্চিন্তার ভার বৃদ্ধি করিতেছি। যখন সুধার পাত্র সম্মুখে রহিয়াছে, তখন কোন্ মূর্খ তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়?

কমলার যে পত্রের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহাতে সে আমাকে লিখিয়াছিল যে সে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে! তিনি আমার জন্য খুব মনঃকষ্ট পাইতেছেন। পুলিশকে তিনি জানাইবেন না—অথবা কোন মামলা মোকদ্দমাও করিবেন না। বিমাতা আমার কথা মনে করিয়া কাঁদেন। হরিমতি তাহার ভবিষ্যৎ বাক্য

সফল হওয়াতে খুব আনন্দিত। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বলিতেছে "সে আমি আগেই জানি"। নন্দদাদা স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে নাকি বলিতেছে 'আমি যেরূপে পারি মাসুকে খুঁজে আন্‌ব।' মুকুলদার সহিত কমলার বিবহের প্রস্তাবে কমলার মা সম্মতি দিয়াছেন। রমেশদার বাড়ীর খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই।"

এই পত্র পড়িয়া আমার প্রাণে বড় দুঃখ হইয়াছিল। বিনতা বেচারী বড় ভাল ছিলেন। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহা কখনও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি চতুরা নারীর মত স্বামীর মন ভুলাইতে কপটতার আশ্রয় নিতেন না। তাঁহার সরল প্রাণ পিতার ইচ্ছা অনুসারে চলিত। তাঁহার জন্য আমার কষ্ট হইল। আর কষ্ট হইল, নন্দদার কথা ভাবিয়া। তাহার অসাবধানতার জন্যই আমি পলায়ন করিতে পারিয়াছি। বোধ হয় এজন্য সে হতভাগ্য বাবার নিকট বকুনী খাইয়াছে। তাই বুঝি সে লেখাপড়া ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এক একবার মনে হইত, ধরা দিয়া এমন সাহসী বীরের মর্য্যাদা রাখি।

বোম্বাই হইতে নাগপুর দিয়া আমরা মাদ্রাজে আসিলাম। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ভিজগাপত্তন ও তৎপরে ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইলাম। এখানকার সমুদ্র তীর আমার বিশেষ প্রীতিজনক বোধ হওয়ায় প্রায় দুইমাস তথায় অবস্থান করি। তারপর পুরী হইয়া কাশী যাই। কাশীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বেড়াইতে বাহির হইলে প্রায়ই বাঙ্গালীর সহিত

সাক্ষাৎ হইত। আমার কেবলি ভয়, কখন্ কোন্ পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হয়—আর ধরা পড়িয়া যাই।

আমি একদিন রমেশদাকে বলিলাম "চল এখান থেকে যাই। চারিদিকে বাঙ্গালী—ফস্ করে কবে চেনা পরিচিত কেউ দেখে ফেল্‌বে, তখনি মুস্কিল"। রমেশদা ইজি চেয়ারে লম্বা হাতলের উপর পা তুলিয়া নিশ্চিন্তমনে চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন—"তোদের মেয়েলী বুদ্ধি নিয়ে কি শর্মারাম কাজ করে? জানিস্ এই কাশীতে যত বাঙ্গালী আছে, তার অধিকাংশই তোর রমেশদার দলের। কেহবা কারো ঘরের বউ বের করে এনেছেন—কেউ বা বিধবা পোয়াতি খালাস কর্‌তে এসেছেন—কেহ আপন রক্ষিতা নারীর হাওয়া বদলাচ্ছেন—আবার এমন কেহ আছেন যাহারা নিজের আত্মীয়া দ্বারা পাপ ব্যবসায় করাচ্ছেন। বাঙ্গালীর কলঙ্কের এই তিনটী স্থান—নবদ্বীপ, কাশী ও বৃন্দাবন। ভয় কচ্ছিস্ কাকে? কে কাকে নিন্দা করবে? এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পথের জনসংঘ কর্তৃক লাঞ্ছিতা এক পতিতা নারী প্রভু যীশুখৃষ্টের আশ্রয় নিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট সমবেত জন-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে প্রথমে এই নারীর প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর। তখন কেহই অগ্রসর হইল না। বাইবেলে এই কথা আছে—মনে আছে? আমি বলিলাম "হাঁ, আছে। তুমি যেমন লোক, কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপকে সেই ভাবেই দেখ্‌ছ। পুণ্যের দিক তোমার চোখে পড়্‌বে কেন? তা যাই হউক, তবু চল। এখানে বেশীদিন থেকে কাজ নেই।"

আমরা এলাহাবাদ ও আগরা হইয়া মথুরায় গেলাম। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান করিলাম। তাজমহল, আগরা ফোর্ট ও সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি প্রভৃতি দেখিবার জন্য পাঁচদিন আগরায় বিলম্ব হইল। প্রায় পাঁচ মাস ঘুরিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমরা মথুরায় পৌঁছিলাম। এখানে কিছু বেশীদিন থাকিবার ইচ্ছা। এত সহর থাকিতে মথুরার উপর রমেশদার এত মন পড়িল কেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীঘাটের নিকটে একেবারে যমুনার ধারে অল্প ভাড়ায় একটী ভাল বাড়ী পাওয়া গেল।

ক্যান্টনমেন্টের দিকে ইউরোপীয় ধরণের হোটেল একটী আছে বটে, কিন্তু সেখানে থাকা রমেশদার মত হইল না। টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সাহেবী ষ্টাইল আর ত চলেনা। রমেশদা বলিলেন "মথুরায় দেশীয় ভাবে থাকাই সুবিধাজনক।" তিনি কোট প্যান্টুলন টাই টুপি ছাড়িলেন। আমার পোষাকে বিদেশীয় ভাব তেমন কিছুই ছিলনা। গোড়ালী উঁচু জুতার বদলে আমি নাগ্‌রাই জুতা পরিলাম। রান্না করিবার জন্য বামুন ঠাকুর রাখা হইল। একটী চাকরও পাওয়া গেল—সে বাজার করিত, জল তুলিত, থালা বাসন মাজিত।

একদিন দেখিলাম রমেশদা গোঁপ কামাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি বলিলাম "ওকি রমেশদা, তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না।" রমেশদা বলিলেন "ভাবনা কি—আবার গজাবে।"

কথাটা পরিহাসের বাতাসে উড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার এইখানে শেষ হইল না। আর একদিন দেখিলাম, রমেশদা

এক নাপিত ডাকাইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, মধ্যস্থলে এক গোছা চুল শিখার মত রাখিলেন। আমার সন্দেহ হইল—ইহার মধ্যে কোন মতলব আছে। তার পর যখন ললাটে নাসিকায় চন্দনের তিলক ছাপ দিয়া, কাছাশূণ্য কাপড় ও মাদ্রাজী জুতা পড়িয়া রমেশদা একবারে দ্রাবিড় পণ্ডিত সাজিলেন, তখন আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে রমেশদা আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না। সমস্ত ঘটনাটী হাসি ঠাট্টার উপর দিয়াই শেষ হইল।

রমেশদা এক সময়ে রেঙ্গুনে থাকিতে মাদ্রাজী কথা শিখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর মন্দিরে যাইয়া তিনি যখন স্বামীজি মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। রামস্বরূপ আয়ার এই নামে রমেশদার চিঠি আসিত। অবশ্য অন্য সহরেও আমরা এযাবৎ ছদ্মনামে বাস করিয়াছি। কিন্তু এবারে রমেশদা যেন একটু বেশী সাবধান হইতেছেন। আমাকে এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

কলিকাতায় থাকিতেই রমেশদা বন্ধুদের সহিত মিশিয়া মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছিলেন! আমি তাহা জানিতাম না। বাহিরে আসিয়া হোটেলে ইউরোপীয়ান ষ্টাইলে থাকার সময় মদ্যপানের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। আমাকেও একটু আধটু খাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপত্তি করিয়া বলিলাম "না—বিশেষতঃ দেহের এই অবস্থায়।" রমেশদা বলিলেন "সে এখনও ছয়মাস দেরী, তা'বলে কি ফুর্ত্তি মাটী করতে হয়! —আর তোমাদের আঁতুড় ঘরে যা খাওয়ান হয়, সে "ভাইনা

গ্যালিসিয়াটা” কি ? সেত খাঁটী এক্স নম্বর ওয়ান।” রমেশদার রোজই দু এক গ্লাস চলিত। গন্ধটা আমার সহিয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও বোতল হইতে আমিও ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধ। মথুরার ক্যান্টনমেণ্টে অনেক গোরা পল্টন আসিয়াছে। চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ জোগাইবার ব্যবস্থা। রমেশদা বলিলেন “মানু, আমি একটু ক্যান্টনমেণ্টের দিকে যাচ্ছি, দেখি—যদি ভাল এক বোতল জোগাড় করতে পারি। এই সহরে কিছু পাওয়ার যো নেই। এরা কেবল সিদ্ধি ভাং নিয়েই ব্যস্ত।” রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি বাড়ীতে একাকী।

চাকর একখানি ডাকের চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম কমলা লিখিয়াছে। চিঠি খানা পড়িয়া আমি বজ্রাহত হইলাম। রমেশদা যে আফিসে চাকুরী করিত, তাহার তহবিল হইতে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। চারি মাসের ছুটী লওয়ার কথা মিথ্যা। রমেশদার বিরুদ্ধে সেই কোম্পানী পুলিশের নিকট অভিযোগ আনিয়াছে। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আমাকে অপহরণ করার অভিযোগ আমার পিতা না করিলেও আমার মামা (নন্দদাদার পিতা) পুলিশকে জানাইয়াছেন। এই উপলক্ষে পুলিশ আমাদের বাড়ী, মুকুলদার বাসা, কমলাদের বাড়ী, রমেশদার বোর্ডিং এবং রমেশদার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াছে। কমলার এবং মুকুলদার নিকট হইতে পুলিশ রমেশদার বোম্বাই ও কাশীর ঠিকানা পাইয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ রমেশদার পিছু লইয়াছে।

আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তারপর রমেশদার উপর আমার অমানুষিক ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইল। আমি কিছু বুঝিনা বলিয়া আমার সহিত এত প্রতারণা—আমি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, তার প্রতিদান বুঝি এই জঘন্য ব্যবহার। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার পরে রমেশ-দা আসিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনি মত্ত হইয়াছেন—চোখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি কঠোর স্বরে কহিলাম "রমেশদা, তুমি যে চা'রমাসের ছুটী নিয়েছিলে, তার উপর আরও একমাস হ'য়ে গেল, অথচ"—আমার কথা শেষ না হইতেই রমেশ-দা জড়িত কণ্ঠে কহিল "সে কৈফিয়ৎ কি তোর কাছে দিতে হবে নাকি?—তুই কি আমার মনিব?" আমি বলিলাম, "কৈফিয়ৎ চাহিনা, কারণত আমায় বল্‌তে পার!"

রমেশ।—আমি আরও তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করেছি। এইবার সন্দেহ মিটেছে?

আমি।—সন্দেহ নয় রমেশদা, তুমি জান, হাতের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহও চল্‌বে না। যদি তুমি এখন কল্‌কাতায় ফিরে না যাও, তবে অন্ততঃ ছুটির মাসের বেতনটাও আনাতে পার। সেওত আটশত টাকা হবে।

রমেশ।—সে ভাবনা তোমায় কর্‌তে হবে না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশালাইটা দাও ত।

আমি হুকুম তামিল করিয়া বলিলাম "রমেশদা, দেখ্‌ছ ত আমার দেহের গতিক। এমন অবস্থায় কোন ভাল সহরে—যেখানে ভাল ডাক্তার অথবা প্রসূতি হাসপাতাল আছে—এমন

স্থানে না থাকিলে আমার ভয় হয়। তাতেও অনেক টাকা খরচ হবে।

রমেশদা টলিতে টলিতে খাটীয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন টাকার "আর ভাবনা কি মানু। দেখেছিস্ ত এক থোকে আড়াই হাজার টাকা।" রমেশদা কাশিতে কাশিতে 'ওয়াক্ ওয়াক্' করিতে লাগিলেন। আমি একটা বাটী সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, "আড়াই হাজার কেন, তিন হাজার বল।" রমেশদা চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন! তাঁহার বমির ভাব চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম "রমেশদা, তুমি তিন হাজার যে ভাবে পেয়েছ তা আমি জানি। সেই রকম রোজগারের আর এক কানাকড়িও আমি চাহি না। যদি ক্ষমতা থাকে, সৎপথে থেকে উপার্জ্জন করে আমায় রাখ—চুরি জোচ্চুরির পথে গিয়ে নিজে মজোনা—আমায়ও মজিও না।"

রমেশদা নেশার ঘোরে বলিতে লাগিলেন "মানু, তোকে নিয়ে আমি সর্ব্বত্যাগী হলুম, আর তুই আমায় চোর বল্‌ছিস? আমি কার জন্যে চুরি করেছি?—কার জন্য স্ত্রীকে ছেড়েছি, মাকে ছেড়েছি?—কার জন্য জেলে পা বাড়িয়েছি? যাঃ—চলে, এই দুনিয়ায় দরদী কেউ নেই—প্রেমের মর্য্যাদা কেউ বুঝলে না। ওরে, চোর না হলে কেউ প্রেমিক হয় না। এই মথুরা তার সাক্ষ্য দিবে। বেশ, তুমি তবে সাধুসজ্জন নিয়ে থাক—আমি এই মূহুর্ত্তে চল্লুম।

রমেশদা উঠিয়া টলিতে টলিতে জুতা পরিলেন, জামা গায়ে দিলেন। একি, সত্যই তিনি চলিলেন। আমি ছুটিয়া যাইয়া

তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম, "রমেশদা আমায় ছেড়ে যেওনা, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর—আমায় অকূল সমুদ্রে ভাসিও না।"

রমেশদা এক লাথি মারিয়া আমাকে দূরে ফেলিয়া ক্রোধোন্মত্ত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "চুপ রও সয়তানী, —আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নিয়ে তুমি থাক।" নেশার ঘোরে তিনিও পড়িয়া যাইতেছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর খুব বমি হইতে লাগিল। বিছানা মেঝে সব ভাসিয়া গেল। দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। বামুন ঠাকুর অথবা চাকর ইহারা কেহ কাছে আসিল না। আমি নিজেই বালতি করিয়া জল আনিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিলাম। সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও আহার হইল না। আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রিতে তাঁর খুব ঘাম হইয়া দেহ একেবারে হিম হইয়া গেল। আমার বড় ভয় হইল। মানসিক উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সারা রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় রমেশদার চৈতন্য হইল। তাঁহাকে স্নান করাইয়া একটু গরম দুধ দিয়া কোকো তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিলাম। কমলার চিঠিখানি তিনি আদ্যন্ত পড়িলেন। বুঝিলেন ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে

আমাদের প্রণয়ের নির্ম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিল। রমেশদাকে এক নূতন চক্ষে আমি দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার চরিত্রের নানাদিক আমার

সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—লম্পট, চোর, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, মাতাল!

পঞ্চম

পাপের পথে

তারপর হইতে নানা খুটিনাটি লইয়া রমেশদার সহিত আমার প্রায়ই ঝগড়া হইতে লাগিল। হাতে নগদ টাকা যাহা ছিল, সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে, মুকুলদার কাছে চিঠি দেওয়ায় তিনি পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিলেন—তাহাও অতি কষ্টে। তিনি অল্প বেতনে সামান্য মাষ্টারী করেন। সেই পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আটাশ টাকা রমেশদা মদ খাইয়া উড়াইয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন এমনই হয়। বেতন না পাইয়া বামুন ঠাকুরটী চলিয়া গিয়াছে। দুই বেলা আমিই রান্না করি। আমি রন্ধন কার্য জানিতাম না—কখনও শিখি নাই। অসুস্থ দেহ লইয়া আগুনের তাপে ও ধোঁয়ায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিত।

মথুরায় একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে বলিলাম সে কথা রমেশদা গ্রাহ্য করিলেন না। শীতের জন্য

দামী পোষাক ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ হইল। ক্রমে ক্রমে আমার গহনাগুলিও বিক্রয় করিলেন। আমার বিমাতা জন্মদিনের উপহার স্বরূপ আমাকে যে একছড়া সোনার হার দিয়াছিলেন, তাহা আমি বিক্রয় করিতে দিব না বলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই অপরাধে আমার উপর খুব মার-ধর ও বকুনি হইল। আজকাল কথায় কথায় লাথি, চড়-চাপড় এসব আমার ভাগ্যে জুটিত। আমি কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহা সহ্য করিতাম।

রমেশদা আমাকে একদিন বলিলেন, "কমলাকে কিছু টাকা পাঠাইতে চিঠি লেখ।" আমি বলিলাম, কমলা দরিদ্র ঘরের মেয়ে, সে টাকা পাইবে কোথায়?" ইহা লইয়া রমেশদা আমার উপর খুব রাগ করিলেন। আমি অগত্যা কমলাকে চিঠি লিখিলাম। সে কুড়ি টাকা পাঠাইল। তাহাও কয়েক-দিনেই ফুরাইয়া গেল।

আমার দুই একখানা দামী কাপড় ও গহনা তখনও ছিল। রমেশদা নানা কৌশলে তাহা আমার নিকট হইতে নিয়া বিক্রয় করেন। কেবল সেই সোণার হারছড়া তখনও আমি দেই নাই। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন "মানু, বৃন্দাবনে প্রেম মহা-বিদ্যালয়ে একটা প্রফেসরী কাজ পেয়েছি। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। লোকটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভয়ানক বিরোধী। আমারও সেইভাব, তুমিত জানই। ...ব খুসী হলেন। আমাকে এখন মাসিক একশত টাকা ...বেন।" আমি শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

... চিন্তাকুল চিত্তে কহিলেন "একটুকু গোষাক

তৈয়ারী করা দরকার—কিন্তু টাকারই ত অভাব।" আমি বলিলাম, "আমার সোণার হারছড়া বাঁধা রেখে কিছু টাকা ধার কর, তারপর একমাসের বেতন পেলেই ছাড়িয়ে আনতে পারবে।" রমেশদা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "না, তাও কি হয়, তোমার সংমার স্নেহের উপহার।" আমি বুঝিলাম, সেদিনের ব্যাপারে আমার উপর এ অভিমান ও শ্লেষ। আমি তখনি আমার হাত বাক্স খুলিয়া রমেশদার কোলের উপর হারটা ফেলিয়া দিলাম। সেই হার বন্ধকে পাওয়া দেড়শত টাকা রমেশদার হাতেই খরচ হইয়াছে। অথচ প্রফেসারী চাকুরীর জন্য যে একস্যুট পোষাক তৈয়ারী করিবার কথা ছিল তাহা হয় নাই।

আমার সন্দেহ হইল, চাকুরীর কথা মিথ্যা। আমার শেষ সম্বল হার-ছড়া হস্তগত করিয়া তাহা দ্বারা মদের মূল্য সংগ্রহ করাই রমেশদার উদ্দেশ্য ছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "কবে থেকে প্রফেসারী আরম্ভ করবে?" রমেশদা বেশ চতুরতার সহিত উত্তর করিলেন "রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হঠাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করেছে। এইত হয়েছে এখন মুস্কিল।" পাছে আমার সন্দেহ হয়, সেইজন্য 'হিন্দুস্থান টাইমস' নামক সংবাদপত্র হইতে পড়িয়া আমাকে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের বিষয় শুনাইলেন।

মথুরায়, বৃন্দাবনে তখন ঝুলনের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমি রমেশদাকে বলিলাম "চল একবার দ্বারকাধীশের মন্দিরে যাই।" তিনি বলিলেন "না, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তুমি লছমনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" লছমন আমাদের চাকরের

নাম। আমি বাহির হইয়া গেলাম। রমেশদা বাড়ীতে রহিলেন।

ঝুলনের সময় মথুরার মন্দিরে মন্দিরে খুব আমোদ প্রমোদ হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত বৃহৎ সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া দোলান হয়। সমস্ত মন্দির আলোক, পুষ্পপত্র, পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। গায়কগণ সুললিত স্বরে ভজন গানে রত থাকেন। এই সকল দর্শন করিলে নানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও শান্তির ভাব আসে।

আমরা বিশ্রাম ঘাটের আরতি এবং আরও দুই তিনটী মন্দিরে ঝুলন দেখিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বাড়ীতে ফিরিলাম। ঘরে যাইয়া দেখি রমেশদা নাই। আলো জ্বলিতেছে। শোবার খাটিয়ার উপরে একখানি চিঠি রহিয়াছে। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে এরূপ ভাবের লেখা ছিল—

"মানু, তোমার সঙ্গে আর থাকা যায় না। তুমি আমায় চোর, লম্পট, মাতাল বলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছ। যেখানে ঘৃণা ও সন্দেহ, সেখানে ভালবাসার স্থান নাই। আজ আমি তিন হাজার টাকা আফিসের ক্যাশে গুঁজে দিলেই আমার চোর অপবাদ ঘুচবে—আরও দু'চার দশটা মেয়ে বের করলেও আমি সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়াব—আর মদ্যপান, সেত বড়লোকের লক্ষণ। তুমি নিজের ভাল বুঝলে না। তোমার আর উদ্ধার নাই। দেখব তোমার নব জাগ্রত নীতিজ্ঞান তোমাকে কতদূর রক্ষা করে। আমি চল্লাম—আমায় খুঁজোনা। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তুমি অবিলম্বে এই বাড়ী ছেড়ে যেও।"

আমার হঠাৎ মনে হইল, একটা পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা যেন

আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে আমি যেন জলের উপরে নাক্ তুলিয়া একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। রমেশদার ব্যবহার আমার এত অসহ্য হইয়াছিল। আমি স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, ভগবান বুঝি তাহারই পথ খুলিয়া দিলেন।

রাত্রিতে রান্না খাওয়া হইল না। গভীর রাত্রিতে আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা আসিল। এখন কি করি, কোথায় যাই। ভাবিলাম, দুর্ব্বল চিত্ত হইলে চলিবেনা। অনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিয়া চারিদিকে চাইতেই রমেশদার জন্য দুঃখ হইল। চা তৈয়ারী করিলাম না। লছমনকে ডাকিয়া বলিলাম "আমি বৃন্দাবনে যাব, একখানি একা অথবা টাঙ্গা ঠিক করে দাও।"

আমার গহনার মধ্যে হাতে দুগাছা সোনার চুড়ী ও কাণে একজোড়া দুল মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া চাকরের তিনমাসের বেতন চুকাইয়া দিলাম। আমার হাতে কিছু টাকাও রহিল। সেই সময়ে কমলার একখানি চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, "রমেশবাবুর সঙ্গে পলায়ন করা তোমার ভুল হয়েছে। এ প্রকার প্রেমের মিলন যেমন হঠাৎ এসে পড়ে, বিচ্ছেদও তেমনি হঠাৎ হয়ে যায়। তোমাদের উভয়ের বিবাহে এমন বিশেষ কিছু বাধা ছিল না। তোমার পিতারও বোধ হয় অমত হ'ত না। এখনও তুমি ফিরে এসে ভ্রম সংশোধন করতে পার।"

কমলার উপদেশ আমার ভাল লাগিল না। তাহার পত্রের কোন উত্তর দিলাম না। বৃন্দাবনে যাইয়া সেবা-কুঞ্জের নিকটে

একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইলাম। তাহার আশে পাশে আরও অনেক বাঙ্গালী স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহাদের প্রায় সকলেই অধিক বয়সের বিধবা। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "মথুরায় থাকিতে আমার স্বামী ও শাশুড়ীর কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি লিখিয়াছি।" সকলেই আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল।

একমাস পরে আমি এই ঘর ছাড়িয়া কেশীঘাটের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। হাতের সামান্য টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একবার জ্বর হইয়া প্রায় দশদিন ভুগিয়াছিলাম। ভিক্ষা করিতে পারিলে আহারের অভাব হয়না, কিন্তু আমার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে চলিতে পারিতাম না।

দুইদিন কিছু খাই নাই। ভিক্ষা চাহিতে জানিনা। বংশীবটের নিকট রাস্তার ধারে শুইয়া আছি। ভাবিতেছি, এখন মরণ আসিলেই বাঁচি। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

ইনি এক সাধু মোহান্তের শিষ্য। মোহান্তজীর বৃহৎ আশ্রম—তাহাতে দেব-বিগ্রহ ও বহুশিষ্য-সেবকাদি রহিয়াছে। মোহান্তজী বাঙ্গালী। তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ মস্তকে জটা, আবক্ষলম্বিত দীর্ঘ শ্মশ্রু—অঙ্গে চন্দন বিভূতি। তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন "একে নিয়ে এসেছ কেন? এ যে অন্তঃস্বত্বা। কোন দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পালিয়ে এসেছে, এখন সেই লোকটা সরে পড়েছে। এর অনেক কষ্টভোগ আছে। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ ঠাকুরের প্রসাদ একে দাও।"

আমি একটু সুস্থ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন "মা, আমার এই আশ্রমে ত স্ত্রীলোক রাখ্‌বার নিয়ম নাই। বিশেষতঃ তুমি গর্ভবতী—সম্মুখে অনেক বিপদ। তুমি এখন কি কর্‌বে বল।" আমি কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া বলিলাম, "বাবা আমি মহাপাপী, আমায় উদ্ধার করুন। আপনি ত মনের কথা সবই জানেন।" মোহান্তজী বলিলেন "হাঁ, আমি সব জানি। তোমার মনের কথা তুমি যাহা না জান আমি তাহাও জানি। এই অনুতাপ ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রকৃত। কামপ্রবৃত্তি একবার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় গজাইয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগশোকে, সাময়িক বিচার-বুদ্ধিতে সেই পাপ বৃক্ষকে মাঝে মাঝে ছেদন করিয়া দেয়; কিন্তু আবার অনুকূল অবস্থায় নূতন অঙ্কুর জন্মে। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভনকে স্থায়ীরূপে জয় করা যায় না। ইহার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন।"

আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম "আমায় ক্ষমা করুন, আমায় আশ্রয় দিন।" মোহান্তজী স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন "মা, অন্নবস্ত্র দেওয়ার দয়া তুমি অনেক পা'বে। সেই দয়ার অভাব সংসারে নাই। তোমাকে এখন যে আক্রমণ করেছে সে দরিদ্র নহে—সে তোমার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্রয় ত তুমি চাওনা, তোমার প্রার্থনা অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহ। আচ্ছা, তুমি ঘরে ফিরে যাবে?"

আমি সম্মতি জানাইলে তিনি আমার পিতার নাম ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। পরে শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন "কলিকাতায় চিঠি লেখ। আশ্রমের পাশের বাগানে রামকিষণ তাহার স্ত্রী ও ছোট দুইটী ছেলে নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে এ স্ত্রীলোটীও

থাক্‌বে। সব ঠিক করে দাও।" শিষ্য চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমার পিতা তোমাকে পুনরায় গ্রহণ কর্‌বেন ব'লে, আমার মনে হয়না। তাঁকে ত সমাজ মেনে চল্‌তে হচ্ছে। পাপ—প্রলোভনের বশীভূত হওয়া একটা আধ্যাত্মিক ব্যাধি। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ না হ'লে চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরাভিমুখী হ'তে পারেনা।"

রামকিষণের পরিবারের সহিত আমি আশ্রমের বাগানে বাস করিতেছি। রামকিষণ বাগানের তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যহ গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, তিনটী গাভী ও কয়েকটী বাছুরকে খৈল,ভূষি খাওয়ান, দশ বার কলসী জল ইন্দারা হইতে তুলিয়া বাগানে দেওয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না করিবার পাত্রাদি মাজা, সাধুদের ভোজন হইয়া গেলে সেই স্থান পরিষ্কার করা, আমার নিজের আহারের জন্য গম পিষিয়া লওয়া আমার নিত্য কর্ত্তব্য-রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই সকল কার্য্য করিতাম। কিন্তু আমার বড় পরিশ্রম বোধ হইত। মোহান্তজীর নির্দ্দেশ অনুসারে আমার মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। কেবলমাত্র প্রভাতে মঙ্গল আরতির সময় আমি মন্দির প্রাঙ্গনে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। মোহান্তজী বাগানে আসিলে প্রয়োজন মত আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন।

একমাস পরে আমার পিতার চিঠি আসিল। তিনি মোহান্ত-জীকে জানাইয়াছেন যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। এমন কন্যাকে তিনি মৃতার ন্যায় জ্ঞান করেন। তখন তর্ক করিবার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমার শরীর ও মন দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ আমি পিতার কথার উত্তর দিতে পারি। আমার এই আত্মচরিত লেখা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে গত ঝুলনের সময় আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। সেখানে মোহান্তজীর সঙ্গে আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করি। তাহার বিবরণ যথাস্থানে লিখিব। তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "বাবাজী, আমি মহা পাপী, সমাজে আমার স্থান নাই—পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মান, মর্য্যাদা, অর্থসম্পত্তি, দেহমন বিক্রয় করেছে, ঐ দেখুন, তাদেরে সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে—তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত—ধনী ও প্রতিপত্তি-শালী বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি-মোহান্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া শুনিয়াও নীরব। কোর্টে, কাউন্সিলে, করপোরেশনে গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোন বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা-বয়সের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করেছিলাম, তার ফলে এই বার বৎসর ধরে, জ্বলে পুড়ে মরছি। এই ত আপনাদের সমাজের বিচার!"

তিনমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন মোহান্তজী বাগানে আসিলে রামকিষণ তাঁহাকে বলিল, "বাবা, এ যে পোয়াতী মেয়ে, এত খাটুনীতে পেটের ছেলেটার কোন কিছু না হয়।" আমি তখন নিকটেই বসিয়া গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতেছিলাম। মোহান্তজী বলিলেন "পেটের ছেলে কি আর বেঁচে আছে! এখন কোনরূপে প্রসব হয়ে গেলে ভাল। এইটুকু

পরিশ্রম না কর্‌লে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।" রামকিষণ আশ্চর্য্য হইল। মোহান্তজী বলিলেন "মেয়েটার দেহে কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করেছে। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মানুষ স্বাস্থ্যবিধিও ভুলে যায়।"

যথা সময়ে আমি একটী মৃত পুত্র প্রসব করিলাম। রামকিষণের স্ত্রী আমার সেবাশুশ্রূষায় রত হইল। এই সরল প্রকৃতি অশিক্ষিতা কৃষকরমণীর মাতৃসম স্নেহের কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন রামকিষণের স্ত্রীর খোঁজ করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম আমি যাইবার আটমাস পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সন্তানপ্রসবের পর আমার নানা রোগ দেখা দিল। কিছু খাইতে পারিতাম না। সন্ধ্যার সময় অল্প জ্বর হইত। সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ। আমি একেবারেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। মোহান্তজী যথাসম্ভব আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় চারিমাস ভুগিয়া আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে আমি বিছানায় পড়িয়া মাথার যন্ত্রনায় ছট-ফট করিতেছিলাম। আমার মনে হইল আমি যেন আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে আছি। মা আমার কাছে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম "মা তোমরা যে থিয়েটারে যাবে, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।" মা বলিলেন "না,—তুই এখন ছেলে মানুষ।" তারপর কে আসিয়া মাকে ডাকিল। মা উঠিয়া গেলেন। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম "মাগো—আমায় নিয়ে যাও,"—রামকিষণের

স্ত্রী পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। আমি তখনও কাঁদিয়া বলিতেছি "মাগো, আমায় নিয়ে যাও গো।" এই স্বপ্নের কথা আমি মোহান্তজীকে বলিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "তোমাকে আরও অনেক ভুগ্‌তে হবে।" আমি দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "মা, আমি দৈবকে অতিক্রম করতে পারিনা। দীক্ষা নেবার তোমার এখনও সময় হয় নাই।"

আরও ছয় সাত মাস গেল। আমার আশ্রম বাস প্রায় এক বৎসর হইল। শরীর একটু ভাল হইয়াছে, এখন শ্রমের কার্য্যও নিয়মমত করিতে পারি। মোহান্তজীর শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাগানে যাইয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য তরীতরকারী ফলমূল শাকসব্জী লইয়া আসিতেন। ইহাদের একজনের সহিত কোন কথা প্রসঙ্গে আমার কুদৃষ্টি দূর হইতে মোহান্তজী লক্ষ্য করেন। আমি যদিও তাঁহার প্রতি কুভাবে আসক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ম্মল চরিত্র। তবুও তদবধি তাঁহাকে আর বাগানে পাঠান হইত না।

আমি এক দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখিয়া তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় আশ্রমে প্রবেশ করি। জানিতাম, তখন মোহান্তজী তাঁহার আসনে ধ্যানস্থ থাকেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, মোহান্তজী আমার দিকে আসিতেছেন। আমি ভীত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সময়ে তুমি আশ্রমে এসেছ কেন? এখন তোমার আসিবার কথা নয়।' আমি কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তখনই উত্তর দিলাম, "শ্যামলী গাইয়ের

বাছুরটা এদিকে ছুটে এসেছে।" মোহান্তজী গম্ভীর স্বরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "বাহিরে যাও—বাছুর এখানে আসেনি। এলেও সে বালিকাগণের কাজ—তোমার নয়—"।

পরদিনই মোহান্তজী আমাকে ডাকিলেন। আমি সভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার নিকটে আর একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। মোহান্তজী আমাকে বলিলেন "তোমাকে আজই এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে। সেখানে ইনি তোমার সকল ব্যবস্থা করে দিবেন।" আমি মনে মনে সুখী হইলাম।

মোহান্তজী সাংসারিক জীবনে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার অনেক বন্ধু বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। যে ভদ্র লোকটীর সঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিলাম, তিনি মোহান্তজীর বন্ধু। তাঁহার গৃহে আমি প্রায় দশ দিন অবস্থান করি।

কলিকাতা নগরের উপকণ্ঠে কোন স্থানে শ্রীযুক্ত—দাস একটী নারী উদ্ধার-আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একজন আইন ব্যবসায়ী। দেশকর্ম্মী বলিয়াও কতকটা প্রসিদ্ধ। মোহান্তজীর বন্ধু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমাকে নারী-উদ্ধার-আশ্রমে রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দাসের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল।

আমার জীবনের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইল। পিতার অনাদর, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ আমাকে পাপের পথে আনিয়াছে। আমি কখনও সংযম শিখি নাই। প্রবৃত্তির অনলে কেবল ইন্ধন দিয়াছি। গল্প, উপন্যাস পাঠ করিবার ফলে সমাজ শৃঙ্খলা

বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই কেবল আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজনার বশে কার্য্যের পরিণামের দিকে দৃষ্টি যায় নাই।

পতিতা নারীদের মধ্যে যাহারা এইরূপে পর পুরুষের অবৈধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কুপথে আসে, তাহাদের সকলের ভাগ্যেই এই দশা ঘটে। সেই পুরুষটী অবোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাকে ছাড়িয়া যায়। এমন কোন পতিতা নারী নাই, যে আমরণ তাহার প্রথম প্রণয়ীর সহিত বাস করিতেছে। অভিজ্ঞতা হইতে ইহার যুক্তি সঙ্গত কারণ আমি দেখাইয়া দিতেছি।

অবৈধ প্রেম উত্তেজনার বশেই জন্মে। উত্তেজনা মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও তাহা কদাচ বিচার বুদ্ধি প্রসূত নহে। সুতরাং যে প্রেম অল্পেতেই জন্মে—তাহা অল্পেতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবৈধ প্রেমে মিলিত নারীপুরুষের বিচ্ছেদের কারণ—একের বা উভয়েরই দোষ অথবা অবস্থার পীড়ন। অর্থাভাব, গর্ভসঞ্চার, রূপ-বিকৃতি, এই সব হইল অবস্থার পীড়ন। মদ্যপানের অভ্যাস, অপরের প্রতি আসক্তি এই সব হইল নারী পুরুষের দোষ।

আমাদের ব্যাপারে দুই-ই ঘটিয়াছিল। রমেশদার মদ্যপান ও আমার অসময়ে সন্তান সম্ভাবনা আমাদের বিচ্ছেদের কারণ। যদি রমেশদা হিন্দুর সামাজিক রীতি অনুসারে আমাকে বিবাহ করিয়া আমার স্বামী হইতেন, তবে তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর কিছু না হউক—শেষকালে একটা আইনের ভয়ও থাকিত—লোকলজ্জা ও সমাজ

শাসন না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। অবৈধ প্রেমে যেমন মিলনের স্বাধীনতা আছে—তেমনি বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও আছে। তাই রমেশদা অনায়াসে আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। সমাজ আজ রমেশদাকে প্রশংসাই করিবে। আমিই হইয়াছি নিন্দার ভাগী। রমেশদা আমাকে শেষ কথা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন।

তারপর, এত দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার শিক্ষা হয় নাই। মোহান্তজীর আশ্রমে এমন পুণ্যের বাতাসের মধ্যে থাকিতেও দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুর আবার আমার হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। সয়তানের প্রলোভন সুখ-স্বর্গের ছবি লইয়া আমার সম্মুখে আসিল। আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম।

ষষ্ঠ

দেহ বিক্রয়

যে সকল স্ত্রীলোক পাপ পথ ছাড়িয়া সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এই উদ্ধার আশ্রমে স্থান পাইত। কোন প্রকার শিল্প কার্য্যাদির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের উপায় তাহারা অবলম্বন করিত। আবার এমন স্ত্রীলোকও সেখানে ছিল, যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। উহারা আমার মত এইরূপ ঘটনা চক্রে জড়িত—সমাজ অথবা পরিবারে তাহারা

যাইতে পারে না। তাহাদের জীবনের গতি অস্থির। উদ্ধার আশ্রমে খাওয়া পরা পাইয়াই যে তাহারা সুখী, আমার তাহা বোধ হইল না। ইহাদের সকলেই কিশোরী ও যুবতী। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন প্রায় ১৩।১৪ জন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে জন পাঁচেক প্রৌঢ়া বিধবা ব্যতীত আর সকলেই এই শ্রেণীর।

আমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় অথবা কু-লোকের প্ররোচনায় ঘরের বাহির হইয়া আসে— অন্নবস্ত্রের অভাবই তাহাদের প্রধান বিপদ নহে। 'কি খাইব'— এই চিন্তা অপেক্ষা 'কিরূপে থাকিব' এই ভাবনাই তাহাদের বেশী করিতে হয়। কলিকাতা সহরে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার ব্যবসা ও চাকরীতে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করা যায়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি ঐ সকল ব্যবসা ও চাকরী যে সকল স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রায় পতিতা নারীর পথে চলিতেছে। ইহার কারণ, তাহারা কখনও বিবাহিত জীবনের সংযমের মধ্য দিয়া আসে নাই। পানওয়ালী, মেস্ বোর্ডিং হোটেলের বা গৃহস্থ বাড়ীর ঝি চাকরাণী, বাজারের মাছ তরকারী ফল মূল প্রভৃতি বিক্রয়-কারিণী, রাঁধুনী, কারখানার মজুরণী, মশলা ঝাড়াই বাছাই-ওয়ালী, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীর্ত্তনওয়ালী, শুশ্রূষাকারিণী, সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী, প্রসবকারিণী দাই, মেয়ে ডাক্তার, রেলের টিকিট আফিসে ও টেলিফোনের মেয়ে কেরাণী—ইহারা সকলেই স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু

তাহা সকল সময়ে হয় না। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি একথা বলিতেছি।

উদ্ধার আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আমি পিতার পরিচয় ও বাড়ীর ঠিকানা সমস্তই গোপন করিয়াছিলাম। তাঁহারা শুধু এইমাত্র জানিলেন, আমি উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুমারী অবস্থায় কোন দুষ্ট লোক আমাকে ঘরের বাহির করিয়া নিয়াছিল। সে গর্ভাবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। রমেশদার নামও আমি প্রকাশ করিলাম না। আমি লেখাপড়া কিছু জানি, ইহা প্রকাশ হইল।

বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা আসিতে আমার খুব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার কারণ, আমি আশা করিয়াছিলাম, আর যাহাই হউক অন্ততঃ মুকুলদা ও কমলাকে দেখিতে পাইব। অকূল সমুদ্রে এই দুইটী বন্ধু আমার তৃণ-স্বরূপ। কিন্তু উদ্ধার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাদের খবর পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

শীঘ্রই কয়েকটী সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইহাদের মধ্যে রাজবালা ও কালীদাসী এই দুইজন ছিল প্রধান। ইহাদের কথা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আরও কয়েক-বার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং ইহাদের একটু পরিচয় দিতেছি। রাজবালা সোণার বেণের মেয়ে। বাপের বাড়ী কলিকাতায়, অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা ও শ্বশুর উভয় পরিবারই সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের এক বৎসর পরেই হতভাগিনী বিধবা হয়। তৎপরে পিতার প্রতিবেশী এক পূর্ব্ববঙ্গবাসী কায়স্থ যুবকের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় জন্মে।

রাজবালার এক জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ এই ব্যাপারে তাহাকে গোপনে সাহায্য করিত। যুবকটী স্বদেশী আন্দোলনের সময় খুব "বন্দে মাতরম্" করিয়া বেড়াইত। তিন বৎসর ধরিয়া এই গুপ্ত প্রেম-লীলা চলিতে থাকে। অবশেষে রাজবালার সন্তান সম্ভাবনা হওয়ায় প্রেমিক যুবক পলায়ন করে। রাজবালা ঝিয়ের সহিত গঙ্গাস্নানের ছলে বাড়ীর বাহির হইয়া আসে। আর সে ফিরিয়া যায় নাই। তারপর নানা দুঃখ দুর্দ্দশার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতে খাইতে এই উদ্ধার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

কালীদাসী সধবা, কামারের মেয়ে। সে রূপসী ছিল। বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে তাহার শ্বশুর ঘর। স্বামীর নিকট হইতে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। তাহারা এক বৎসর ধরিয়া তাহাকে নানাস্থানে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ইহা লইয়া মামলা মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমার পরে কালীদাসীর স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল না। তাহার এক আত্মীয়ের পরামর্শে সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাইতেছিল। বর্দ্ধমান সহরের কোন উকীল জানিতে পারিয়া তাহাকে এইখানে পাঠাইয়া দেন।

ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম, উদ্ধার আশ্রমটী আমাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। অন্ন বস্ত্রের কোন ক্লেশ নাই। আমাদের মধ্যে যাহারা রূপযৌবন সম্পন্না, তাহাদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও কাহারও একটু বিশেষ দৃষ্টি। আমার উপর তাঁহাদের শীঘ্রই অনুগ্রহ পড়িল। আমাকে কাজ কর্ম্ম করিতে হইত না। আমার থাকিবার ঘর বিবিধ আসবাব পত্রে সজ্জিত হইল। আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। আমার ভাল কাপড় চোপড়, দামী জামা

সেমিজ পরিপাটী বিছানা। অন্যান্য মেয়েরা কেহ কেহ আমাকে এজন্য ঈর্ষা করিত। রাজবালা ও কালীদাসী আমাকে দেখিলেই মুচ্‌কি হাসিয়া বলিত, "এবার তোর ভাই কপাল ফিরেছে।"

কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। আমিও ধরা দিলাম। তিনি আমার ঘরে মাঝে মাঝে রাত্রি যাপন করিতেন। জানিলাম, আমার মেয়ে বন্ধুদের গৃহেও কর্ত্তৃপক্ষদের অপর কেহ কেহ গোপনে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।

একদিন আমি আমার গুপ্ত প্রণয়ীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। আমার সমবয়সী মেয়েরা মিলিয়া মাঝে মাঝে আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা তুলিয়া হাস্য পরিহাস করিতাম। রাজবালা ও কালীদাসীর সহিত প্রাণের কথা হইত। আমার পরামর্শে উহারা দু'জনেও বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমি বলিলাম "ভাই, যদি রূপ যৌবন বেচ্‌তে হয়, তবে লুকিয়ে চোরের মত কেন—একেবারে বাজারে নেমে দর যাচাই করে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় কর্‌ব।" রাজবালা ও কালীদাসী সেইদিন হইতে তাহাদের প্রণয়ীদিগকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমিও তাহাই করিলাম। আমাদের উপর নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা স্থির করিলাম, উদ্ধার আশ্রমে আর থাকিব না। কিন্তু আমরা নিরাশ্রয়—নিঃসহায়, কোথায় যাই।

তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ ভীষণভাবে চলিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক শুশ্রূষাকারিণী নারী আহত সৈন্যদের সেবার জন্য

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। সেই জন্য কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের হাসপাতালগুলিতে নার্সের কাজ করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের আশ্রমে সংবাদপত্র আসিত। আমি বাংলা খবরের কাগজ হইতে পড়িয়া অন্যান্য মেয়েদের শুনাইতাম।

রাজবালার মাথায় কি এক মতলব আসিল। সে একদিন আমাকে বলিল "আয় ভাই, আমরা নার্সের কাজ শিখি।" আমি বলিলাম "আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা না করিলে ত হয় না।" শ্রীযুত—দাস মহাশয় একদিন আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিলে রাজবালা তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে কথা বলিল। তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদিগকে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। কালীদাসী লেখাপড়া জানিত না। তাহাকে শিখাইয়া লইবার ভার আমার উপর পড়িল। তিনমাসের মধ্যেই সে খুব উন্নতি দেখাইল। মাঝে মাঝে আমাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে আমরা ডাক্তারী নানাবিধ যন্ত্র ও ঔষধাদির নাম শিখিতাম।

গুপ্ত প্রণয়ীরা আমাদিগকে তখনও ছাড়ে নাই। তাহাদের অত্যাচারে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। একটা মেয়ের উপর একদিন পাশবিক অত্যাচারের উপক্রম করায় সে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য পাশের বাড়ীতে লাফাইয়া পড়ায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য মোকদ্দমাও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলাফল শুনি নাই। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি, রাজবালা, কালীদাসী ও আর একটী মেয়ে (তাহার নাম এখন আমার মনে নাই—বোধ

গাড়ী ভাড়া করিয়া টালিগঞ্জে আসিলাম; সেখান হইতে ট্রামে আমরা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটী আমার পরিচিত ছিল। বাল্যকালে পিতার সহিত এই উপাসনা মন্দিরে অনেকবার আসিয়াছি। আজ সেই কথা মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। উপাসনা শেষ হইয়াছে। সমবেত উপাসকগণ প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল কয়েক জন বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের ব্রাহ্ম মহিলার মত কাপড় পরা ছিল। পায়ে জুতাও ছিল। আমরা অগ্রসর হইয়া গেলাম।

ব্রাহ্ম সমাজে আসিবার ষড়যন্ত্র আমরা অনেক দিন হইতেই করিতেছিলাম। রাজবালাই ইহার মূল কারণ। সে বলিয়াছিল ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই গ্রহণ করে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিবাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু শেষে আমরা দেখিলাম, সেখানেও বাধা আছে।

সম্মুখে একজন পক্ক-কেশ-শ্মশ্রু বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া রাজবালা আমার কানে কানে বলিল "এই বুঝি কৃষ্ণকুমার মিত্র—প্রণাম কর।" আমরা চারি জনেই পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া সকল কথা বলিলাম, এবং আমাদের রক্ষার উপায় করিতে অনুরোধ করিলাম। উদ্ধার আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদের দুর্ব্ব্যবহার ও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের অভিলাষ তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি বলিলেন "আপনাদের রক্ষার উপায় একাকী আমা দ্বারা

সম্ভবপর হয় না। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন।" তৎপরে তিনি একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিকটে ডাকিলেন। তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলা হইলে তিনি বিশেষ ঘৃণার সহিত আপত্তি জানাইয়া কহিলেন—"না—তা কিরূপে হয়? ইহাদের পূর্ব্বজীবন কলুষিত। ব্রাহ্ম সমাজে কি পাপ প্রবেশ করিবে?" আমরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার সময় পুনঃ প্রণাম করিতে গেলে শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন; কিন্তু অপর লোকটী, পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম হেরম্ববাবু—"না—না" বলিয়া সরিয়া গেলেন। এই ভদ্র লোকটীর সহিত পরে আমার আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা বলিলে তিনি দুঃখিত হইতে পারেন মনে করিয়া বলিলাম না।

আমরা ভাবিতে লাগিলাম এখন কোথায় যাই। উদ্ধার আশ্রমে আর আমাদিগকে নিবেনা। সেখানে ফিরিয়া যাওয়াও আমাদের ইচ্ছা ছিলনা। হঠাৎ আমার কমলার কথা মনে হইল। তাহার বাড়ীর ঠিকানা আমি জানিতাম। অন্ততঃ দুই একদিন সেখানে থাকিতে পারিব, এইরূপ ভরসা হইল। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনই বাগবাজারে কমলার বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, কমলা তাহার মাতার সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সে বাড়ীতে নাই। অন্যলোক ভাড়াটে রহিয়াছে। তাহারা কমলাদের কোন সন্ধান দিতে পারিল না; আমি যেন একেবারে বজ্রাহত হইলাম। দীর্ঘকাল পরে নানা দুঃখ ভোগের পর বাল্যকালের প্রিয়বন্ধু কমলাকে

দেখিব বলিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল—কিন্তু সে আশা যে এরূপভাবে বিনষ্ট হইবে, তাহা কখনও মনে করি নাই। আমি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

মুকুলদার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলার সন্ধান তাঁহার কাছে পাওয়া সম্ভব ছিল। আর কি উপায় আছে? রাজবালা বলিল "ভাই আজ রাত্রির মত আমি তোমাদিগকে একটা পরিচিত জায়গায় রাখিতে পারি। তারপর কাল সকালে যাহা হয় করা যাইবে।" আমরা অগত্যা সম্মত হইলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।

সেই ঘোড়ার গাড়ীতেই আরও বেশী ভাড়া দিয়া আমরা চাঁপাতলায় হাড়কাটা গলিতে এক পতিতা নারীর গৃহে আশ্রয় লইলাম। এই স্ত্রীলোকটী রাজবালার পূর্ব্ব জীবনের পরিচিতা। সে সমস্ত বাড়ীটা নিজে ভাড়া লইয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বেশ্যা ভাড়াটে বসাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কিছু লাভ হইত। এতদ্ভিন্ন পাপ ব্যবসায়ে উপার্জ্জন ছিল। এই প্রকার স্ত্রীলোককে পতিতা নারী সমাজে 'বাড়ীওয়ালী' নামে অভিহিত করা হয়। ইহাকে সকলে রাণী বাড়ীওয়ালী বলিয়া ডাকিত।

রাজবালাকে অনেকদিন পরে পাইয়া, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বাড়ীওয়ালী অতিশয় আনন্দিত হইল। সে পরম যত্নের সহিত আমাদের সকলকে একটী ঘরে থাকিতে দিল, তাহাতে বিছানা পত্রেরও অভাব ছিল না। আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থাও হইল। রাজবালার

দুশ্চিন্তায় আমার মনে শান্তি নাই। জীবনে এই প্রথম আমি ব্যবসাদার খাঁটী বেশ্যার ঘরে প্রবেশ করি। আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নীচের তলায় এক কোণে ঘর—আলো বাতাস নাই। চারিদিকে একটা নূতন রকমের দুর্গন্ধ। কোথাও মাতালের বমি, কোথাও গান বাজ্‌না—কোথাও হৈ হৈ চীৎকার, কোথাও গালাগালি, ঝগড়া, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। অথচ এখান হইতে পলাইয়া কোথায় যাইব, তাহাও জানিনা।

পরদিন সকালে খেঁদি বলিল, বেলিয়াঘাটায় তার এক মাসীর বাড়ী আছে, সে সেখানে যাইবে। আমরা আপত্তি করিলাম না। সে চলিয়া গেল। আমরা আরও তিন চারি দিন সেই বাড়ীতে রহিলাম। ইতিমধ্যে বাড়ীওয়ালী আমাকে ও কালীদাসীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে মত লওয়াইল। সেই চতুরা নারীর সঙ্গে আমি তর্কে পারিলাম না। সে যে সকল যুক্তি দেখাইল তাহার সার মর্ম্ম এই—বেশ্যারা স্বাধীন ; ভগবান তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন—পুরুষকে ভুলাইবার কৌশল দিয়াছেন কিসের জন্য ?—তাহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে। উকীল তাহার বুদ্ধি বিক্রয় করে—পণ্ডিত তাহার বিদ্যা বিক্রয় করে—এমন কি দীক্ষাগুরুও মন্ত্র বিক্রয় করেন, তবে রূপবতী কেন দেহ বিক্রয় করিবে না ? বিপদ ভয় সকল ব্যবসায়েই আছে। দেশের বড় বড় লোক সমস্ত বেশ্যাদের পায়ে বাঁধা। ধনী লোকদের টাকা বেশ্যাদের ঘরে উড়িয়া আসিয়া পরে। তাহাদের একটা কটাক্ষের মূল্য সহস্র টাকা।

আমি ভুলিলাম। বাড়ীওয়ালী আমার জন্য ঘর দেখিতে লাগিল, কালীদাসী সেই বাড়ীতেই ঘর নিল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপরে যেখানে এখন সিটিকলেজের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার নিকটে এক বস্তীতে আমি ও রাজবালা দুইখানি খোলার ঘর ভাড়া লইলাম। রাণী বাড়ীওয়ালী আমাদের দুই-জনকেই কিছু টাকা ধার দিয়া জিনিষপত্র ও কাপড়-চোপড় সমস্ত জোগাড় করিয়া দিল।

কুসঙ্গে কিরূপ অধঃপতন হয়, আর এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। আমার স্কুলে পড়া বিদ্যা সমস্ত ভুলিয়া যাইবার গতিক হইল। মুকুলদার কাছে কত নূতন বিষয় শিখিয়াছিলাম—সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি এখন সব চাপা পড়িয়া গেল। আমি যাহাদের সঙ্গে ছিলাম, তাহারা কেহ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিত না। কেবল কা'র কয়টা লোক জুটিয়াছে—কা'র প্রণয়ীর সঙ্গে কি আলাপ হইল—আর যত সব অশ্লীল ব্যাপার, ইহাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। তারপর নিজেদের রান্না ও ঘরের কাজ সমস্ত করিতে হইত। আমরা লজ্জায় বাজারে যাইতাম না। অন্য কাহাকেও দিয়া বাজার করাইতাম।

লম্পট প্রণয়ীকে পতিতা সমাজে 'বাবু' বলা হয়। এখন হইতে আমি এই শব্দটী মাঝে মাঝে ব্যবহার করিব। এই 'বাবু' লইয়া খুব গোলযোগ হইত। কোন পতিতার প্রণয়ী অন্য নারীর ঘরে প্রবেশ করিলে তাহা লইয়া তুমুল ঝগড়া বিবাদ বাঁধিয়া উঠিত। সকলেই তাহাতে যোগ দিত। আমিও বাদ যাইতাম না। আর যত রকমের অশ্লীল অশ্রাব্য কথা শুনিতে

আসিয়া তিনি [illegible]

মাকে ডাকিয়া বলিল "কাল রাত্রিতে যে লোকটী আমার
। এসেছিল তিনি কে জানিস্ ?—বৈঠকখানা বাজারের কাছে
একটা কলেজ আছে, সেই কলেজের তিনি বড় প্রফেসার
র নাম শ্রী......পাধ্যায়। তিনি আরও দুই তিন দিন আমার
এসেছিলেন।" আমিত নাম শুনিয়া অবাক্। এঁর কথা
দার মুখে কতবার শুনিয়াছি। ইনি সাহিত্য খুব ভাল
ন। আমি ভাবিলাম এই প্রফেসারের নিকট হইতে মুকুলদার
। খবর পাওয়া যায় কিনা দেখিব।

নী বাড়ীওয়ালী আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিত,
। তাহাকে রাণীমাসী বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে আমার ভয়
গল। আমি দেখিলাম অন্য সকল স্ত্রীলোক আমোদ-
দ মত্ত থাকে—নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করে—গঙ্গাস্নানে,
াটে যেখানে সেখানে নির্ভয়ে যায়। তাহারা আমাকে
, এখন আর ভয় করিস কাকে ? গবর্ণমেণ্টের কাছে
একবার নাম রেজেষ্টারী করিয়েছিস—যখন একবার
যে স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি নিয়েছি, তখন আর কে
কি বলবে ? নাচতে নেমে লজ্জা কর্‌লে চলবে কেন ?
ীমাসী বলিল, "তোমার পিতা যখন মনে করেন তুমি
, তিনি যখন তোমায় আর ঘরে নিবেন না, তুমিও তাঁর
ছে আশ্রয় প্রার্থনা কচ্ছনা, তবে আর পিতাকেই বা ভয়
সের ? আমি বলিলাম "তবু পিতা যদি দেখেন, তাঁর কন্যা তাঁর
পাপ ব্যবসা করছে তাঁর মনে দুঃখ হয় না ?" রাণীমাসী
"তিনি কন্যাকে ঘরে নিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ থেকে

জানতে আমার সাহস হইয়াছিল। বুঝিলাম, স্কুলের
হইতে যে অল্পবিদ্যা পাইয়াছি তাহা আমার অহঙ্কার বাড়াই
সর্ব্বনাশ করিয়াছে—কিন্তু আমাকে পাপের আক্রমণ হই
বাঁচাইতে পারে নাই।

আমরা সন্ধ্যার পরে সাজিয়া গুজিয়া আরতি দেখিবার
নিকটবর্ত্তী ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীতে যাইতাম। সেখানে কি
দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম আমরা কোন ভদ্রবেশধারীর ন
পড়িয়াছি, তখন বাড়ীর দিকে যাত্রা করিতাম। সেই ভদ্রে
ধারী ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ লইত। এইরূপে শিকার ধরি
কৌশল রাণী বাড়ীওয়ালী আমাদিগকে শিখাইয়াছিল।

আমি প্রথমে যাইতে আপত্তি করিতাম। আমার ভয়
যদি বাপের বাড়ীর কাহারও সঙ্গে দেখা হয়। যদি নন্দদাদা
হরিমতি ঝি, অথবা বাবার মোটর ড্রাইভার, এমন কি
নিজেই যদি দেখিয়া ফেলেন। রাজবালা আমাকে সাহস
বলিল, "তোদের বাড়ীত এ পাড়ায় নয়—সেত এখান
অনেক দূরে, কলিকাতার মত সহরে কে কার খবর
এ পাড়ার লোক ও পাড়ায় যায় না।" আমিও বুঝিলাম
অবশেষে আমি সাবধানে রাজবালার সহিত বাহিরে যাই
আমার আর একটা আশা ছিল যদি মুকুলদাকে কখনও
দেখি। কারণ আমার মনে পরে তাঁহার বাড়ী এ পা
ছিল।

একদিন শীতের রাত্রিতে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী হই
ফিরিবার সময় দেখিলাম, একজন ভদ্রলোক মাথায়
জড়াইয়া আমাদের পিছু পিছু আসিতেছেন। আমাদে

স্বরক্ষা পেতে পারেন। মা, এ পথে যখন এসেছ, তখন অনেক শঙ্কিত চিত্র তোমার চখে পর্‌বে। দেখ্‌বে সত্যই পিতার সম্মুখে কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করছে—দেখ্‌বে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন রাণীকাকে বেশ্যাবৃত্তি কর্‌বার জন্য নিত্য সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছে—একটিবে সত্যই ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন বেশ্যার উপার্জ্জিত অর্থে ভরণপোষণ করছে। পতিতা শুধু আমরা নই—প্রায় সমস্ত জই অধঃপতিত হয়েছে।”

ক. আমি ও রাজবালা কোন উত্তর না দিয়া নীরবে শুনিতেছিলাম। দেখ-মাসী পুনরায় বলিতে লাগিল, “মানী, কোন দিন হয়ত আ বে তোমার নন্দদাদাই তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছে। সমা ার মকুলদাও আস্‌তে পারে। মনে কিছু করো না মা, আমি কথা বল্‌ছি, কোন দিন হয়ত আমার ঘরেই তোমার পিতার রাণী সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে।

দেখ আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। রাজবালা মাথা নীচু করিল, তে সী বলিতে লাগিল, “আর কি বল্‌ব মা। সে দিন যে স্ত্রীলোক রামবাগান থেকে আমার বাড়ীতে এসেছিল, ত তোমরা দেখেছ। তার ইতিহাস শুনবে? তার পিতা ......ভট্টাচার্য্য; কলিকাতার কোন কলেজে খুব বড় অধ্যাপকের কাজ কর্‌তেন। বেশী বয়সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রামবাগানে আপন রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়ে শেষকালটা কাটাচ্ছেন—এই ত অবস্থা। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, তোমরাও দেখ্‌বে।”

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোকের

ঘরে একদিন দেখি, সে একদিন একটা ছবিকে ফুলের মালা দিয়া সাজাইতেছে। স্ত্রীলোকটীর বয়স কিছু বেশী—সৌন্দর্য্য তখনও রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবিখানি ক'ার? সে মেয়ে স্ত্রীলোকটি বলিল, উহা শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি। তিনি তাহার সমাজের একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "ওহো—সেই শিবনাথ শাস্ত্রী, যাঁর 'নিমাই সন্ন্যাস' কবিতা আমরা স্কুলে কত মুখস্থ করেছি—না—

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে,
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' বলে,
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?—

বাবার মুখেও এঁর নাম মাঝে মাঝে শুনতাম।" তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি তুমি তোমার রেখেছ কেন?" সে বলিল "আমি যখন ১৭।১৮ বৎসরের তখন এক প্রৌঢ়া পতিতা নারী আমাকে আশ্রয় দেয়। ছোট দুইটী ছেলে ছিল। তাহার প্রণয়ী বাবু তাহাকে এব বাড়ী দান করেন। রূপ-যৌবন বিক্রয় লব্ধ অর্থে আত্মপরি করবার জন্যই সেই স্ত্রীলোকটী আমাকে এনেছিল। সে চাঁপাতলার কোন ছুতারের মেয়ে, ৭ বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার পুনঃ বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। নানা কারণে তাহা হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সে বাল্যকালে দাদা বলে ডাকত। অবশেষে ঘটনাচক্রে সে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করল। আমি তাহার আশ্রয়ে আসবার পর একদিন শিবনাথ

শাস্ত্রী সেই বাড়ীতে আসেন এবং তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ কর্‌বার জন্য অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সেই স্ত্রীলোকটীর হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। তখনও আমি তাহার বাড়ীতে ছিলাম। আমি তাহাকে মা বলে ডাক্‌তাম। সে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই ছবিখানা তখন কিনে আনে। প্রতিদিন সে ইহাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। মর্‌বার সময় সে আমাকে এই ছবিখানি দিয়ে গেছে এবং যতদিন বাঁচি এম্‌নি করে ফুল দিয়ে সাজাতে বলেছে। তার মৃত্যুর পর সেই দুই ছেলে বাড়ী দখল নিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন এইভাবে আছি।"

আমি বলিলাম "শিবনাথ শাস্ত্রী এত বড় উদার-চরিত্র, পাপীকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য বেশ্যালয়ে আস্‌তেও ঘৃণা করেন নি ?" সেই স্ত্রীলোকটী ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া বলিল, তিনি অনেক পতিতাকে সৎপথে এনেছেন। ঢাকার এক পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণিকে তিনি উদ্ধার করে এক ব্রাহ্ম যুবকের সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন, সে গল্পও আমি শুনেছি।" আমি বলিলাম "আর এখন ব্রাহ্ম-সমাজ কি হয়েছে! আমরা সেদিন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে আশ্রয় নিতে গেলুম, তারা আমাদের নিলে না। হেরম্ব বাবু নামে একজন, (পরে শুনেছি তিনি হেরম্বচন্দ্র মৈত্র) আমরা 'পাপী বলে' আমাদের প্রণাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করলেন না। বোধ হয় আজ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঁচে থাক্‌লে আমাদের এ দশা হ'ত না।"

এই অস্বাস্থ্যকর খোলার ঘরে থাকিবার ফলে আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। রাণী-মাসীর পরামর্শে গর্ভসঞ্চার

নিরোধ করিবার জন্য একটা ঔষধ খাইয়াছিলাম—তারপর হইতে আমার নানা রোগ দেখা দিল। রাজবালাও সেই ঔষধ খাইয়াছিল, কিন্তু তার কোন অসুখ হইল না। আমি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শরীরে বেদনা। হাত পায়ের তলায় বিশ্রী দাগ—মুখে গায়ে ফুস্কুরীর মত হইয়া যন্ত্রণা-দায়ক ক্ষত উৎপন্ন হইল। রাণী-মাসী দেখিয়া বলিল, হাসপাতালে না গেলে আর রক্ষা নাই।

আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বিছানায় পড়িয়া দিবারাত্রি অবিরত কাঁদিতাম। চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইত। সেইবার রোগে ভুগিয়া বুঝিয়া ছিলাম, মরণে বোধ হয় সুখ আছে। আত্মীয়, বন্ধু কেহ নাই। বাড়ীর অন্য স্ত্রীলোক সকলে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সকলকেই ব্যবসায়ের খাতিরে দরজায় দাঁড়াইতে হয়। তারপর সারা রাত্রি অনিদ্রায় মদ্যপানে অথবা নানা প্রকার উত্তেজনায় কাটাইয়া তাহারা বেলা ৮ টা ৯ টায় ঘুম হইতে উঠে। আমাকে কে দেখ্‌বে? চারিদিকে একটা বীভৎস ব্যাপার আমার চক্ষে পড়িল। আমরা যেন শূকরীর দল—কাদায় গড়াগড়ি দিতেছি। বুঝিলাম, এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

রাণী-মাসী ও রাজবালা দুজনে মিলিয়া আমাকে হাসপাতালে দিয়া আসিল। তিন মাস পরে সুস্থ হইয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম। তখন আমার হাতে একটী পয়সাও নাই।

সপ্তম

সমাজ চিত্র

বৃন্দাবনের সেই মোহান্তজী আমায় বলিয়াছিলেন, "অন্নবস্ত্রের দয়া তুমি অনেক পাবে।" তাঁহার কথাটী যে সত্য, এই প্রমাণ আমি জীবনে বার বার পাইয়াছি। দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন নহে—কিন্তু প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারে না। অধিকন্তু সেই রাক্ষসীর গ্রাসে ঠেলিয়া দিবার লোক অনেক আছে।

রাণী-মাসী এবার আমাকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে দোতালায় একখানা ভাল ঘর খালি হইয়াছিল। সে পুনরায় আমাকে টাকা দিয়া সাহায্য করিল। আমি তখন বুঝি নাই, এই প্রকার দয়ার কার্য্যই আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া নেয়।

আমার যে বিদ্যা ছিল, তাহাতে আমি কাহারও বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াইতে পারিতাম, টেলিফোন আফিসে কাজ করিতে পারিতাম—নার্সের কাজ করিতে—গান শিখাইতে পারিতাম, কিন্তু এই সকল সৎপথে অর্থ উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি এবং সুযোগ কেহ আমাকে দেয় নাই। কেবল রূপযৌবনের পসরা লইয়া বাজারে ঘুরিবার দুর্ম্মতি রাণী-মাসী আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "রাণী-মাসী, আমার দেহকান্তি মলিন হয়েছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষীণ, বিশুষ্ক। মাথার চুলের আর সে পূর্ব্বের শোভা নাই। আমার দ্বারা এই পথে আর কি উপার্জ্জন হবে?" রাণী মাসী আমাকে বুঝাইল; "পতিতার রূপই প্রধান সম্পত্তি নহে। লম্পটেরা রূপ দেখিয়া মোহিত হয় না। দেখ্‌বে অতি কুরূপা বেশ্যা, সুন্দরীদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন কচ্ছে। এই জন্যই বলে 'যার সঙ্গে যার মজে মন।' পুরুষগুলি যখন সন্ধ্যাবেলা বেশ্যা-পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়—তখন কন্দর্পঠাকুর তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেন।"

রাণী-মাসী আমাকে কতকগুলি কৌশল শিখাইল। কাপড় পরিবার ফ্যাশন, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে—তাহা যে কপট, তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মদ্যপানাসক্ত হইলে তাহার মন রক্ষার জন্য কিরূপে মদের গ্লাস ঠোঁটের কাছে ধরিয়া মদ্যপানের ভাণ করিতে হয় তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায়, তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এই প্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে আর একটী নূতন মানদার সৃষ্টি হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার স্বরও আমার বেশ সুমিষ্ট ছিল, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ বিদ্যাটী পতিতার জীবনে

কাজে লাগে। রাণী-মাসী আমাকে গান শিখাইবার জন্য কজন ভাল ওস্তাদ রাখিল। সে বলিল, "তোমার ব্রহ্ম সঙ্গীত বা স্বদেশী গান ত এখানে চল্‌বে না। টপেটা, হিন্দী গজল, থবা উচ্চ অঙ্গের খেয়াল ঠুংরী এসব হ'ল বেশ্যা মহলের ওয়াজ। কীর্ত্তনও শিখ্‌তে পার।" আমি তিন চারি মাসের ধ্যই সঙ্গীত শিক্ষায় উন্নতি দেখাইলাম। কীর্ত্তন শিখিতে ছু দেরী হইল।

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিদ্যাও খিতে হইয়াছিল। কে চুরির মতলবে আসিয়াছে—কে কুৎসিত গাক্রান্ত—কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভালমানুষ ও সরলচিত্ত, সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয়। অনেক সময়ে পদেও পরিয়াছি। একদল লোক আছে, তাহারা বেশ্যা বাড়ীতে কাতি করিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও বেশ্যাকে হত্যাও রিয়া থাকে। এমনিভাবে প্রাণটী হাতে লইয়া পতিতা নারীকে বসা করিতে হয়। দু-পাঁচ টাকার জন্য কোন নারী একেবারে পরিচিত পুরুষকে গ্রহন করে—হয়ত সেই বিশ্বাসঘাতক লোকটীর বুকে ছুরি বসাইয়া তাহার গহনাপত্র লইয়া পলায়ন রিল। হতভাগিনী আর চক্ষু মেলিল না। পতিতারা পাপের স্তি এইরূপেও হাতে হাতে পায়।

আমার ঘরে একটী ভদ্রলোক আসিতেন। তিনি কলিকাতার একজন ভাল চিকিৎসক। আজ পর্য্যন্ত তিনি নাকি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। আমার শরীর যাহাতে শীঘ্র সারে, সেইজন্য তিনি খুব ভাল ভাল

ঔষধ আমাকে দিয়াছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার অসাধা নৈপুণ্য ছিল তাঁহার মত একজন চিকিৎসককে এত বেশী টা দর্শনী দিয়া আনান আমার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যেদিন ; তিন ঘণ্টা আমার ঘরে বসিতেন, সে দিন আমাকে দশ বিশ টা দিতেন। কখনও কখনও সন্ধ্যার পরে আমাকে মোটরে লই বেড়াইতে বাহির হইতেন—গ্রাণ্ড হোটেলে, গঙ্গার ধারে অথ ইডেন গার্ডেনে বেড়াইয়া আমরা অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতা সেদিন আমি ৫০৲ টাকা পাইতাম। তাঁহার অনুগ্রহে আম মাসে প্রায় দুইশত টাকা উপার্জ্জন হইত।

রাণী-মাসী আমাকে সাবধান করিয়া বলিল, "মা, রোজগার পার এইবেলা করে নাও। শেষ বয়সের কথা মনে রেখো এখন থেকে কিছু না জমাতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাবে দেখছ ত, এপথে বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই। একমাত্র টাকাই সব; আমি এই চিকিৎসক মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইয়া অন্যদিকে রোজগাে একটু ঢিলা দিয়াছিলাম। রাণীমাসী বুঝিয়াছিল, এই বা চিরদিন থাকিবেন না। তার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

সেই বৎসর আশ্বিনমাসে পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ ঝড় তুফান হয় তাহাতে বহুলোকের প্রাণনাশ ঘটে। লোকের ঘর বাড়ী, বাগান শস্যক্ষেত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কলিকাতায় এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও চিত্তরঞ্জন দাশ (উভয়েই এখন পরলোকে) এই সৎকার্য্যে অগ্রণী হ'ন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র টাকা সংগৃহীত হইতে থাকে। যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া

ক্ষা করিত। বেশ্যা-পল্লীতেও তাহারা আসিত। আমরাও সেই
ায্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছি।

একদিন আমার সেই চিকিৎসক বাবু আমাকে বলিলেন "মাসী,
মেরা পতিতা নারীরা মিলে যদি কিছু চাঁদা তুলে ঐ
ইবেঙ্গল সাইক্লোন ফণ্ডে পাঠাও, মিঃ সি, আর, দাশ তা'হলে
শেষ সন্তুষ্ট হ'বেন। তাঁর ইচ্ছা, এই সৎকার্য্যের জন্য সমাজের
ল স্তরেই সাড়া পড়ুক। কি বল, পারবে?"

আমি বলিলাম 'দেখুন, আমি ত এ পথে নূতন। সকলের
চেনাশুনা নাই। আপনি ভরসা দিলে আমার যতদুর সাধ্য
ব।" তিনি বলিলেন, "রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগানে
ার জানাশুনা আরও কয়েকজন মেয়েমানুষ আছে—
য়টারের অভিনেত্রীদেরও এর মধ্যে আনা যায়।"

চিকিৎসক মহাশয়ের সঙ্গে নাকি মিঃ সি, আর, দাশের
রচয় ছিল। তাঁহারও কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতার বেশ্যা
হইতে কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা উঠিল। জনসাধারণের কার্য্যে
আমার প্রথম যোগদান। এই সুযোগে আমি মিঃ সি, আর,
কে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমরা যখন প্রণাম করিয়া
ার পায়ে টাকার তোড়া রাখিলাম, তখন আনন্দাশ্রুতে
ার বক্ষ প্লাবিত হইল। তিনি আমাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া
ার্ব্বাদ করিলেন। বুঝিলাম তিনি সত্যই দেশবন্ধু।

রাজবালার সহিত একদিন দেখা করিতে গিয়া দেখি, তাহার
খুব ভাল দামী আসবাব পত্র আসিয়াছে। একখানা পালঙ্ক,
য়াল আয়না, বুককেস্ এই সব জিনিষে ঘর সাজান

রহিয়াছে। বিছানার জন্য গদী তৈয়ার হইয়াছে। তাহার গা[
কিছু নূতন গহণাও দেখিলাম। রাণী-মাসীর টাকা সে পরিশো[
করিয়াছে; তাহার নিজের হাতে কিছু নগদ টাকাও জমিয়াছে
খোলার ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের এত অর্থ উপার্জ্জন হয়, আম
পূর্ব্বে ধারণা ছিলনা। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি
রাজবালা কহিল "নানাপ্রকার লোক বেশ্যালয়ে আসে। যাহ
ধনী জমিদারের ছেলে, তাহারা বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রকাশ্যে বেশ্যা[
নিকটে যায়। লোক-লজ্জা, ভয় ইহাদের নাই। ইহারা মদ্যপ
গানবাজনা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়। ছোটখাট খো[
ঘরে ইহাদের পদার্পণ হয়না। রামবাগান, সোনাগাছিই তাহা[
প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আর একদল লম্পট আছে, যাহারা সমা[
নিন্দার ভয় করে—যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানি
তাহারা একাকী গোপনে বেশ্যাগৃহে আসে। কেবলমাত্র প্রবৃ[
তাড়নাই ইহাদের আসিবার কারণ। গান বাজনা, বা অ[
কোন আমোদ প্রমোদ ইহারা চাহেনা। লুকাইয়া লুকাই
ইহারা আসিয়া চলিয়া যায়—এদিকে লোক সমাজেও নিজে[
মান মর্য্যাদা ও সুনাম রক্ষা করে। কবি, সাহিত্যিক, স[
সংস্কারক, নামজাদা উকীল—স্কুলের মাষ্টার, কলেজের প্রফেসার,
রাজনীতিক নেতা, উপনেতা, গবর্ণমেণ্ট আফিসের বড় কর্ম্মচা[
ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তর্কবাগীশ প্রভৃ[
উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মোহান্ত, গুরুগিরি ব্যবসায়ী [
সকল লোক এই শ্রেণীর। আমার ঘরে একজন হাইকো[
বিখ্যাত উকীল আসেন। তিনি অতি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তান

তাঁহার নাম শ্রী……। বয়স একটু বেশী। তিনি আমাকে অনেক টাকা দেন। আমি সেই বাবুকে একদিন ঠাট্টা করে' বলেছিলাম, তুমি হাইকোর্টের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। আমার সেই কথা ফলে গেছে। তিনি সত্যসত্যই হাইকোর্টে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি খুসী হ'য়ে আমায় এইসব জিনিষ পত্র কিনে দিয়েছেন। আমার এই দামী আংটীটা তাঁহারই উপহার।"

রাজবালার সহিত কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। আমি চলিয়া আসিব বলিয়া উঠিয়াছি এমন সময় একজন লোক রাজবালার ঘরে প্রবেশ করিল। রাজবালা সেই লোকটীকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমি বাহিরে আসিয়া অস্ফুট স্বরে রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?—এঁকে ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত দেখাচ্ছে।" রাজবালা বলিল "ইনি আমার এক বাবু। খুব বড় অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী পণ্ডিত। ইনি আজকাল আমায় নিয়ে খুব মজেছেন। তবে শুনেছি এঁর একটা দোষ আছে—নিত্য নূতন চাই। বেশ্যা মহলে ইনি সুপরিচিত। খোলার ঘরেই এঁর যাতায়াত বেশী। আমি যতদূর পারি ক'সে আদায় ক'রে নিচ্ছি—কি জানি আবার কোনদিন সরে পড়্বে।"

কিছুদিন পূর্ব্বে কালিদাসী হাড়কাটা গলির বাড়ী ছাড়িয়া রামবাগানে উঠিয়া গিয়াছে। সে একজন ধনী ভাটিয়া সওদাগরের নজরে পড়িয়াছিল। একদিন কালীদাসীর নূতন বাড়ীতে যাইয়া দেখি তা'র অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তেতলায় দু'খানি বৃহৎ ঘর—একখানি বসবার, একখানি শোবার। ইলেকট্রীক্

লাইট, পাখা। পালঙ্ক, বুক্‌কেস্‌, বৃহৎ আয়না, ছবি, মার্ব্বেল পাথরের টেবিল, মেজেতে লিনোলিয়াম্‌ পাতা, শুভ্র ফরাস্‌ বিছানা কোমল তাকিয়ায় শোভিত—রূপার পানের থালা, এস্‌ট্রে। কৃষ্ণনগরের সুন্দর মাটীর পুতুলে আল্‌মারী সাজান। তিনসেট জড়োয়া গহনা—দুই সেট তোলা,—একসেট গায়ে। দামী বেনারসী সাড়ী ও ব্লাউজ তাহার বেড়াইবার পোষাক; শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার দেশী সাড়ী তাহার আটপৌরে কাপড়। তাহার ভাটিয়া বাবু তাহাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা নগদ দিত। এতদ্ব্যতীত ঘর ভাড়া ও খাওয়াপরার খরচ চালাইত।

কালীদাসীর এই সৌভাগ্য আলাদিনের প্রদীপের মত দুই তিন মাসের মধ্যে হইয়াছে। আমি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কি এক উজ্জ্বল আশার আলোক আমি সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কোন্‌ সয়তান আমার অন্তরের মধ্যে বার বার জাগিয়া বলিতে লাগিল, "এমন সৌভাগ্য তোমারও হ'তে পারে।" আমি সেই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালীদাসী রূপসী ছিল। এখন ভালভাবে থাকিবার ফলে তাহার সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া বাহির হইল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইলেও কালীদাসী গান জানিত। আমিও তাকে কিছু শিখাইয়া ছিলাম। এ বাড়ীতে তাহার এক মা জুটিয়াছে। কালীদাসী বলিল এই স্ত্রীলোকটাই তাহাকে এই ভাটিয়া বাবু জোগাড় করিয়া দিয়া হাড়কাটা গলি হইতে রামবাগানে আনিয়াছে। কালীদাসী আমাকেও ঐ পাড়াতে যাইতে পরামর্শ দিল। আমি সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

রাণী-মাসীর পাওনা আমি প্রায় পরিশোধ করিয়াছিলাম। আমার আর কোন ঋণ ছিল না। ঘরের জিনিষপত্র চলন-সই রকম হইয়াছে। এই সময়ে আমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তিনি ব্রাহ্মণ যুবক, কোন ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী......পাধ্যায়। দুই তিন দিন আমার ঘরে আসিয়া তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আমার গানেই তাঁহাকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিল।

তিনি আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে একটু উঁচু ষ্টাইলে রাখ্‌তে চাই। হাড়কাটা গলিটা অতি অভদ্রের জায়গা—এখানে যত ছোট লোকের আমদানী।" আমি মনে মনে কহিলাম "হায়রে বেশ্যার আবার ভদ্রাভদ্র বিচার—পতিতারও উচ্চ নীচ স্তর বিভাগ—এদেরও জাতিভেদ।' এখনই অন্য স্থানে উঠিয়া গেলে আমার চিকিৎসক বাবুটিকে হারাইব এই ভাবিয়া আমি সম্মত হইলাম না। প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলাম, "আমার দেনা-টেনা আছে—বাড়ীওয়ালীও কিছু টাকা পাবে, উঠ্‌তে হলে দু'চার মাস পরে উঠা যাবে।"

এই ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দুই একজন বন্ধুবান্ধবও আসিত। কেহ সামান্য পরিমাণে মদ খাইতেন। তবে নিতান্ত মাতাল কেহ ছিলেন না। আমি কখনও কখনও লুচি, পরোটা, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। এইরূপে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। আমার এই বাবুটীর খুব পান খাওয়া

অভ্যাস ছিল। সোনালী রূপালী তবক দেওয়া দামী পান সর্ব্বদা তিনি খাইতেন। তিনি বড় সৌখীন পুরুষ ছিলেন। ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী বলিয়া তিনি একখানি সুন্দর বৃহৎ মোটর গাড়ী পাইয়াছিলেন। তাহাতে চড়িয়া তিনি আমার গৃহে আসিতেন। আমরা তাহার মোটরে অনেকবার বেড়াইয়াছি।

আমি কিছুদিন দুইদিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। আমার চিকিৎসক বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, আমি অন্য প্রণয়ীর হাতে পরিয়াছি! তিনি ক্রমশঃ কম আসিতে লাগিলেন। শেষে আসা একদম বন্ধ করিলেন। আমার পাধ্যায় বাবু সর্ব্বদাই আমাকে এ পাড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিতেন। আমার দেনাপত্র শোধ করিবার নাম করিয়া তাহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা নগদ আদায় করিলাম। আর নূতন বাড়ীতে যাইয়া বসিতে আরও অতিরিক্ত দুইশত টাকা লাগিবে, বলিলাম। তিনি সেই টাকাও দিলেন। আমি রামবাগানে কালীদাসীর বাড়ীর নিকটেই একটা বাড়ীতে দু'খানি ভাল ঘর ভাড়া লইলাম।

আমার সেই চিকিৎসক বাবুটি এক্ষণে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি তখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। পতিতার ব্যবসায় প্রথম আরম্ভ করিয়া আমি অবিবাহিত যুবক দিকেই একটু বেশী পছন্দ করিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, গৃহে তাহাদের পত্নীর আকর্ষণ না থাকাতে তাহারা পতিতার প্রতি বেশী আসক্ত হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, যাহারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে তাহারা নিজের রক্ষিতা নারীকেও ভালবাসে। অবিবাহিত যুবকেরা

প্রায়ই চঞ্চলচিত্ত এবং তাহারা কাহারও উপর নিজের মনকে স্থিরভাবে বসাইতে পারে না।

আমার চিকিৎসক বাবুটী আমাকে ছাড়িয়া অনেক নারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন—সে সংবাদও আমি শুনিয়াছি। এমন কি গৃহস্থের ঘরেও তিনি নাকি কেলেঙ্কারী ঘটাইয়াছেন। খবরের কাগজে সেই ইঙ্গিত দিয়াছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

রামবাগানে আসিয়া আমার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটিতে লাগিল। কিন্তু আমার একটা দুঃখ মাঝে মাঝে প্রাণে জাগিয়া উঠিত। মুকুলদা অথবা কমলার কোন সংবাদ পাইতাম না। পিতা, মাতুল বা নন্দদাদা ইহাদের দেখা পাইতে আমার ভয় হইত; দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কমলা মুকুল-দা এই দুই জন ত আমার পাপজীবনের গতির সূচনা জানে। সুতরাং তাহাদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত। পতিতার জীবন কিরূপ বিপদগ্রস্ত তাহা এই অল্প সময়েই আমি বুঝিয়াছি। আর সকলে আমায় ঘৃণা করে করুক—পায়ে ঠেলিয়া ফেলে ফেলুক—মুকুলদা ও কমলা, কখনও আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় ছিল।

রামবাগানে আসিয়া আমি পড়াশুনায় মন দিলাম। বাবুকে বলিয়া পুস্তক রাখিবার জন্য একটা আলমারী কিনিলাম। বাংলা ইংরাজী সাহিত্য গ্রন্থাদি তাহাতে সাজাইলাম। বাবু আমার জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক সংবাদপত্র, প্রবাসী ও ভারতবর্ষ তিনি আমায় কিনিয়া দিতেন। দৈনিক খবরের কাগজ তিনি আফিস হইতেই লইয়া আসিতেন। আমি তাহা পড়িতাম।

গানে, পড়াশুনায়, বাবুর ভালবাসায় আমার মন একপ্রকার সাময়িক স্থিরতা লাভ করিল।

এই সময়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আসিয়াছে—তাহার সহিত আমাদের পতিতা জীবনের নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কুলটার চরিত্র লইয়া বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুলটার প্রতি ঘৃণার ভাবই বদ্ধমূল হয়। কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে কুলটার পরিণাম, ভীষণ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তই দেখিতে পাই। এতাবৎকাল পতিতা নারীর জীবনের এমন দিক দেখান হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া লোক পতিতা নারীর সংস্পর্শে যাইতে ঘৃণা বোধ করে—লজ্জিত হয় ও ভয় পায়। অমৃতলাল বসুর তরুবালা নাটকেও তাহাই দেখান হইয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসে কুলটার চরিত্রের অপর একদিক দেখাইয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি লোকের সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ সেনগুপ্ত এবং বহু তরুণ সাহিত্যিক তাহা খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কুলটা ও পতিতা নারীর কোন কোন চরিত্র এমনভাবে দেখাইয়াছেন, যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন "বেশ্যারা অসতী হইতে পারে—কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের আদর্শে হীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরল চিত্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, দয়ার্দ্র হৃদয়, দানশীল হইয়া থাকে, তখন তাহারা ঘৃণার পাত্র হইবে কেন?

এই সকল উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য তরুণ যুবক যুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' পড়িয়া রাজলক্ষীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল—'শুভা' পড়িয়া 'শুভ সঙ্গিনীর' মত অভিনেত্রীর সন্ধানে বাহির হইল। 'পরপারে' নাটকের সরযূকে পাইতে তাহারা পাগল হইল। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি, বাঙ্গলার তরুণ যুবকের দল ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় কলুষ সংস্পর্শে আসিতেছে।

পতিতা নারীর জীবনের এই চিত্রকে নব্য সাহিত্যিকের দল 'রিয়্যালিষ্টিক আর্টের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্ব্বনাশী বিষ ছড়ান হইতেছে। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন—সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদার পুত্র আপনার স্ত্রী কন্যা লইয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র দর্শক মণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় দেখাইতেছেন—পিতামাতা কন্যাদিগকে থিয়েটারের ষ্টেজে নাচিতে পাঠাইতেছেন। স্বামী স্বকর্ণে শুনিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী অভিনয়চ্ছলে অপরের সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতেছেন—পিতা দেখিতেছেন, কুমারী কন্যা রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছলা কলা শিখিতেছে। যিনি বিশ্বকবির উচ্চ আসন পাইয়াছেন, যাঁহার কাছে জগৎ মহৎ আদর্শের প্রত্যাশা করে, তিনি থিয়েটারে যাইয়া নটীদের গানের মহড়া দেওয়াইতেছেন। যে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে দেশ উচ্চ সুনীতির আদর্শ পাইতে চায়, তাহারাও আর্টের নেশায় মজিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, লেডী অবলা বসু, শ্রীযুক্তা

কামিনী রায়, মিসেস্ বি এল চৌধুরী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ইঁহা-দের মত লোকও ভদ্র ঘরের যুবতীদের নৃত্যের সমর্থন করেন। ইহা লইয়া সাময়িক সংবাদ পত্রাদিতে বহু বাদ প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে,আমি তাহা পাঠ করিয়াছি,আর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি।

আমার আত্মচরিত লিখিতে যাইয়া এত কথা বলিবার প্রয়ো-এই যে, আমাদের মত পতিতা নারীর জীবনে যে অসযংম ও অসাবধানতার ফল, তাহা সমাজের প্রায় সকল স্তরে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমার অভিপ্রায় ও নিবেদন। যে অপরিণামদর্শী যুবকের কুহকে পড়িয়া আজ আমি পতিতা— এই প্রকার রাণী চুনীর প্রেমিকও এই সকল নাচ গানের কর্ণধার রূপে আছেন, তাহা কি অভিভাবকগণ খবর রাখেন না? নিজে মজিয়াছি বটে কিন্তু সমাজকে মজিতে দেখিলে দুঃখ হয়। আমাদের চুনীর বাবু-শিল্পিটী·····সম্মিলনীর' একজন বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক। চুনীর নিকট এই সম্মিলনীর দুই একটা অপবাদও শুনিয়াছি। সত্যমিথ্যা ঠিক না জানায় উল্লেখ করিলাম না।

নব্য সাহিত্যের এ। রয়্যালিষ্টিক আর্টের ফল আরও একদিকে দেখা দিল। পূর্ব্বে পতিতা নারী সৎকার্য্যে অর্থদান করিতে চাহিলে অনেক স্থলে তাহা গৃহীত হইত না; এমন কি মফঃস্বলের ভূম্যধি-কারী পতিতার নিকট হইতে ভূমির করও নাকি গ্রহণ করিতেন না। ক্রমশঃ এই ভাব দূর হইতে লাগিল। এ বিষয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অতি উদার হৃদয় ছিলেন। জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে তিনি শুধু পতিতার দান গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—

পতিতাদিগকে তিনি দেশ হিতকর কার্য্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু আমাদের মত নীচ দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। ১৯১৮ সালের পর হইতে তাঁহার হস্তে ক্রমশঃ দেশের নেতৃত্ব ভার আসিতে থাকে। এ দিকে নব্য সাহিত্যও পতিতাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সুতরাং আমরা প্রকাশ্যে ভদ্র সমাজে মিশিবার একটা সুযোগ পাইলাম। ইহার ফল কি হইল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

জন সাধারণের হিতসাধন সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিবার বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমার জীবনের আর দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিতেছি।

আমাদের বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক একখানি ঘর ভাড়া লইল। সে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা অবগত হইলাম। এই স্ত্রীলোকটী দরিদ্র কায়স্থ ঘরের বিধবা। তাহার গুরু শ্রী......বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনি এখন আর কাছে ঘেঁসেন না। স্ত্রীলোকটী কলঙ্কের ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বেশ্যা পল্লীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ এই স্থান সকল কলঙ্ক ও পাপের ভাণ্ডার। আমি এই হতভাগিনীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমার পরামর্শে স্ত্রীলোকটী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিল। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিলেন। আমি নানা ছলে তাঁ'র সঙ্গে পরিচয় করিলাম। এ

বিষয়ে আমার ব্যাঙ্কের বাবুটীর নিকট প্রয়োজন মত উপদেশ লইয়াছি। একদিন আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে একটু বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়া বলিলাম, "দেখুন, এই বেচারী এখন দুঃসময়ে পড়েছে···আপনি যদি পরিত্যাগ করেন, এর উপায় কি হবে?" কিন্তু তিনি আমার কথা উপেক্ষা করিলেন। তখন আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম "মহাশয়, আমরা পতিতা নারী—আপনাদের ঘৃণিতা, আর আপনি সমাজের কর্ত্তা, আজ আমার কাছ থেকে আপনি তিরস্কার শু'নে যেতে চান কি? ছিঃ ছিঃ আপনার লজ্জা হয়না? গুরুগিরি করতে গিয়ে সরল হৃদয় বিধবা শিষ্যানীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন, দরিদ্রকে কলঙ্কে ডুবিয়েছেন। আপনি না স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—আপনি না অধ্যাপনা করে থাকেন? আপনার পাণ্ডিত্যে ধিক্—আপনার শাস্ত্র জ্ঞানে শত ধিক্। আমরা মহাপাপী বারবনিতা, আমরা নরকে যাব, ইহা সত্য—আপনারা নরকে যাবেন না, কেন জানেন?—আপনাদের জন্য এত বড় নরক কুণ্ড এখনও তৈরী হয় নি।" আমার কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। আমি না থামিয়া,—তাঁর মুখের কাছে তর্জ্জনী হেলাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "আপনি যেতে চান, চলে যান। কিন্তু জানবেন, আমি এদিক দিয়ে আদালতে নালিশ করে আপনার কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করে ছাড়ব। জানি, আপনি অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু আমরা এ বাড়ীর সকলে সাক্ষ্য দিব যে আপনি এই ঘরে আসতেন,এবং আপনার দ্বারা এর গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। আমরা তো কতই মিথ্যা কথা বলি···যা'তে একজন নির্দোষ নারীর উপকার

হয়—যাতে এক শঠ লম্পটের শাস্তি হয়, সেইরূপ মিথ্যা বলতে আমাদের জিহ্বা আটকাবেনা।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম—তিনি ভয় পাইয়াছেন। কয়েকদিন পরে তিনি আসিয়া আমার হাতে একশত টাকা দিয়া বলিলেন "এর জন্যে যা কিছু খরচ পত্র প্রয়োজন হয়, এই টাকা থেকে করবে।" আমি তাহা গ্রহণ করিলাম এবং স্ত্রীলোকটীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড় করিয়া দিলাম। যথাসময়ে ইহার প্রসব হইল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রসূতি ও সন্তানকে আমাদের বাড়ী হইতে সরাইয়া নিলেন। তার পর খবর লইয়া জানিয়াছিলাম, তিনি বিধবাটীকে বিশেষ অর্থ সাহায্য করেন নাই। এই লোকটীর দুশ্চরিত্রের কথা অনেকেই জানিত। আরও কয়েকটী শিষ্যানীর সর্ব্বনাশ তিনি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার চাকুরী স্থলে বেনামী চিঠিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলাম। এমন সর্ব্বনেশে লোকের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। পরে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ভাল ভাল চাকুরী সব গিয়াছে। সংবাদ পাইলাম, তিনি নাকি বৃদ্ধ বয়সে এক ষোড়শী বালার পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্তরের যৌবন ক্ষুধা মিটাইতেছেন। সমাজের যে অংশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহার এমন গলিত ক্ষত দেখিয়া, পতিতাদেরও ঘৃণায় নাক সিট্‌কাইতে হয়।

আমাদের বাড়ীর নিকটে সুশীলা নাম্নী এক বারবনিতা বাস করিত। সে এক নবাবের রক্ষিতা। তার বিপুল সম্পত্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য। উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নবাব বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজধানীতে বিরাট প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি থাকেন না। রাজধানী ছাড়িয়া কলিকাতায় এই রক্ষিতা বারনারীর নিকটেই অবস্থান করেন। এদিকে তাঁহার সোণার পুরী শিয়াল কুকুরের আবাস স্থল হইতেছে, প্রজাগণের দুর্দ্দশার একশেষ—সুব্যবস্থা ও শাসনের অভাবে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া তাহা নটীর পূজায় ব্যয় করিতেছেন। নবাব বাদসার মত লোক পতিতার প্রেমে মজিবে, ইহাতে নূতনত্ব নাই। তবে একথা এখানে উল্লেখ করিলাম কেন? তাহার কারণ আছে। সুশীলার ঘরে যাইয়া প্রায়ই দেখিতাম নবাবের রাজধানী হইতে বহুমূল্য আসবাব পত্র, ছবি, পর্দ্দা, হীরা জহরৎ, আয়না, গজদন্তের কারুকার্য্যখচিত দ্রব্য, এ সমস্ত আসিতেছে। ইহার কোন কোনটি বিক্রয় করা হইত—কোনটি বা সুশীলার ঘরেই শোভা পাইত। এই সকল দ্রব্য নবাবের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ রাজধানীর পুরাতন প্রাসাদে সজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিক কীর্ত্তি দর্শনার্থীরা তাহা দেখিয়া অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। একটা তুচ্ছ বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য এই কীর্ত্তিচিহ্ন সমূহ কি মূর্খের মত ধ্বংস করা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি দুঃখ করিতাম। যাহারা পূর্ব্বপুরুষের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা পরাধীন হইবেনা ত হইবে কে?

সুশীলার বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ী ক্রয় করা হইয়াছে। সুশীলা নবাবের প্রধানা বেগমের চেয়েও অধিক ঐশ্বর্য্যে—অধিক আদর যত্নে আছে। নবাব ঋণ করিয়া, মণিমুক্তাদি বন্ধক রাখিয়া সুশীলার এক হাজার টাকা মাসোহারা জোগাইতেছেন। ঋণের

দায়ে নবাব বাহাদুর মামলাতেও জড়িত হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শৈলশৃঙ্গে বজ্রাঘাত পড়িল।

আমি পতিতা নারী হইলেও রাজনৈতিক সংবাদ লইয়া থাকি। আজকাল যাঁহারা স্বাধীনতার কথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এদেশের নবাব বাদসার বংশধরেরা যদি স্বাধীনতার প্রিয়-স্মৃতিচিহ্ন সমূহ এমনি নির্ম্মম হৃদয়ে পতিতার কলুষিত প্রেমানল শিখায় আহুতি দেয়, যদি পূর্ব্বপুরুষের হাতের জিনিসের চেয়ে, বেশ্যার বিলোল কটাক্ষের মূল্যই বেশী হয়, তবে স্বাধীনতার আশা কোথায়? অপবিত্র আবর্জ্জনার স্তূপে স্বাধীনতার বিশাল বোধি-দ্রুমের জন্ম হয়না।

অষ্টম

অগ্নি ক্রীড়া

১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে উহার পরিচালন ভার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রহণ করেন। ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িবে—উকীল ব্যারিষ্টার আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন, কেহ কাউন্সিলে যাইবেনা—গবর্ণমেণ্টের উপাধি বর্জ্জন করা হইবে—বিদেশী দ্রব্য কেহ কিনিবেনা; এই পাঁচ রকমের বয়কট্ সেই অসহযোগ নীতির মূল মন্ত্র ছিল। ইহার প্রচারের জন্য সমস্ত দেশে, গ্রামে গ্রামে

নগরে নগরে সভা সমিতি বক্তৃতা, পিকেটিং অর্থাৎ বিরোধকারী-দিগকে বাধা দেওয়া চলিতে লাগিল, যুবকেরা স্বেচ্ছা-সেবকদল গঠন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কর্ম্মী চাই—কর্ম্মী চাই এই রব উঠিল।

ভদ্রমহিলাগণও পুরুষের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাঁহাদের নেত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মী মহিলাদের মধ্যে উর্ম্মিলা দেবী,সুনীতি দেবী,সন্তোষকুমারী দাসগুপ্তা,মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার,বগলা সোম ইহাদের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল হইতেও বহু সংখ্যক মহিলাকর্ম্মী আসিতে লাগিল। সে কি উৎসাহ—কি উদ্দীপনা,কি এক অপূর্ব্ব কর্ম্ম চঞ্চলতা দেখিয়াছিলাম। এই সকল মহিলা কর্ম্মীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নারী-কর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব।

পুলিশ চারিদিকে খুব ধর-পাকড় আরম্ভ করিল। মহিলা কর্ম্মীরাও পুলিশের হাতে নিস্তার পান নাই। আমরা কয়েকজন পতিতা নারী মিলিয়া একটা ছোট দল গঠন করিলাম। আমাদের বাবুগণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্ব্বে ইষ্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতে যাইয়া আমরা বাহিরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহস,চতুরতা ও দক্ষতা বাড়িয়াছিল। অনেক ছোট বড় দেশনেতার সহিত পরিচয়ও হইয়াছিল। এবার যখন আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে নামিলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের,

সহকর্মীরা অতিশয় সুখী হইলেন এবং আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা এত তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, একসঙ্গে সকলে কাজ করিবার সময় মনে থাকিতনা যে,আমরা অস্পৃশ্য ঘৃণিত বেশ্যা—আর ইঁহারা সম্মানিত ভদ্র গৃহস্থ যুবক। সেই কর্ম্মী যুবকেরাও ভুলিয়া যাইত যে তাহারা বারবনিতার সহিত চলাফেরা করিতেছে। যে সকল পবিত্র-চরিত্র ব্যক্তি কখনও বেশ্যালয়ে আসেন নাই বা আসিবার কল্পনাও করেন নাই,তাঁহাদের সঙ্গে আমরা এই অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া এক মোটর গাড়ীতে বেড়াইয়াছি,হাস্য পরিহাসের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে কথাও বলিয়াছি। সকলে আমাদের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতেন---গর্ব্বের আনন্দে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিত।

একদিন কর্ম্মশেষে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে বারবনিতার দল, তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করিলেন "শেষকালে এরাও এসে কাজে নেমেছে—এটা কি ভাল হচ্ছে, মিঃ দাশ?" চিত্তরঞ্জন শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন "আপনারা হ'লেন রুচিবাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিল্‌বে না। সঞ্জীবনী সম্পাদক কেষ্ট মিত্তিরের কাছে যান। তিনি আপনাদের মনের মত লোক। কেশব সেনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হ'য়ে উদার মত অবলম্বন কর্‌বার জন্য সাধারণ-ব্রাহ্ম-

সমাজের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু শেষে উহারই মধ্যেও ক্ষুদ্রতা দেখা দিল। কূপের মত এতটুকু হলে হবে না—সমুদ্রের মত প্রশস্ত বিশাল হ'য়ে সকলকে গ্রহণ করা চাই। পাশ্চাত্য দেশে কি দেখ্ছেন? আমাদেরও তাই কর্তে হবে। যাদের ঘৃণায় দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাই আজ এগিয়ে আস্ছে। এ শুভলক্ষণ, আমি আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনায় এক অপূর্ব্ব শক্তির সন্ধান পেয়েছি।"

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক কতদূর চলিয়াছিল জানি না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমরা দেশবন্ধুর আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। আমরা সেই মহাপুরুষের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশসেবার অনলে আমাদের সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহা হইল না। দেশকর্ম্মীদের সহিত বারবনিতাদের এই প্রকার অবাধ মেলা মেশার ফল ভাল হইল না।

আগুন লইয়া খেলা বড় বিপজ্জনক। সকলে তাহা পারে না। আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়া দেশ-নায়কগণ ভুল করিয়াছিলেন। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে একটা পবিত্রতার ভিত্তির প্রয়োজন। আমাদের তাহা ছিল না। আমরা শুদ্ধচিত্ত ও সংযত না হইয়াই একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, ইন্দ্রিয়পরতা এই সব হইল বারবনিতাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। দেশের কার্য্যে ব্রতী হইলেও আমাদের এই সকল দুষ্প্রবৃত্তিই আমাদিগকে পরিচালিত করিত। সুতরাং কথায় যে বলে "শিব গড়িতে বানর"—আমাদেরও হইল তাহাই।

যে সকল কর্ম্মী যুবকের চরিত্র-বল এমন ছিল যে একটা

সিগারেট পর্য্যন্ত কখনও খায় নাই, তাহারা কেহ কেহ এই অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান পর্য্যন্ত শিখিয়াছে। যে সকল যুবক এমন পবিত্র চিত্ত ছিল যে স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিবার সময় মাথা তুলিত না—তাহারা আমাদের সংসর্গে আসিয়া এখন বেশ্যা দূরে থাক্ কুলবধুর সহিত নির্ল্লজ্জের মত কুৎসিত হাস্য পরিহাস করিতে অনেকে লজ্জিত হয় না। পতিতানারীদের একটা প্রধান স্বভাব এই যে তাহারা সচ্চরিত্র ও সংযতচিত্ত পুরুষ দেখিলে তাহাকে হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে, এবং তাহার সংযম ও পবিত্রতাকে বিনষ্ট করা একটা বীরত্বের কার্য্য বলিয়া মনে করে।

আমি জানি, আমরা যে কয় জন এই অসহযোগ আন্দোলন কার্য্য করিতে গিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকে অনেক দেশকর্ম্মী যুবকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই অপরাধ হইতে মুক্তি নহি। এমন কি কেহ কেহ পিতৃতুল্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পারিষদদিগের প্রতিও কটাক্ষ হানিতে ছাড়ে নাই। বাড়ীতে ফিরিয়া আমরা এই আলোচনাই করিতাম,—কে কয়টা নূতন 'বাবু' জুটাইয়াছে,—কার ঘরে কোন্ দেশকর্ম্মী আসিলেন—পরের টাকায় কেমন পান সিগারেট খাওয়া হইল—মোটর চড়া গেল--ট্যাক্সী ভাড়ার টাকা হইতে কে কত আঁচলে বাঁধিয়াছে, ইত্যাদি

আমরা যে শুধু যুবকদের অধঃপাতে লইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধুরাও আন্দোলনে যোগ দিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অবশ্য উাহারা উদার, শিক্ষিত পরিবারেরই বৌঝি। সাধারণতঃ গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাদের অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে

এভাবে বাহিরে যাইতে দেন না। গৃহস্থ ঘরের যে সকল মহিলা আমাদের সহিত কার্য্য করিতেন তাঁহাদের কাহারও সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলাপ হইত। আমি জানি, কয়েকটী ভদ্র গৃহস্থের বধূ অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের স্বামীর নিকট ফিরিয়া যান নাই। কেহ কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন—কেহ বা কোন দেশকর্ম্মীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ স্বামী স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। এই সকল দেশকর্ম্মীর আচরণ সকল লোকই জানে, অথচ তাহারা ভোট দিয়া এই প্রকার সাধু-বেশী লম্পট স্বভাব ব্যক্তিদিগকেই করপোরেশন কাউন্সিলে প্রেরণ করে। সমাজের অন্ধতা এতদূর গভীর।

এই সম্পর্কে একটী ঘটনা বলিতেছি। মফঃস্বলের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যুবকের স্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনে মহিলা কর্ম্মীদের সহিত কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, এই বধূটী পরমাসুন্দরী—আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার একদিন কথাবার্ত্তাও হইয়াছে। এই পুস্তকখানি যদি কখনও তাঁহার হাতে পরে, তবে তিনি হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহার সহিত আমার অল্প পরিচয়েই একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি যে অধঃপাতে গিয়াছেন, তার জন্য অংশতঃ কে দায়ী, তাহা আমি জানি।

আমার মনে আছে, আমি ব্রাহ্মণ কুলবধূটির সহিত একটু অন্তরঙ্গভাবে নানা ভাবের আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি

এক দেশকর্ম্মী কায়স্থ যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন। এই যুবকটী উচ্চ শিক্ষিত আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ আমার এমন সুন্দরী যুবতী বন্ধুটী যে শেষকালে একটা পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবকের প্রেমে মজিবে তাহা ভাবি নাই। একবার এই ব্রাহ্মণ বধূটি অপর কতিপয় মহিলাকর্ম্মীর সহিত প্রচার কার্য্য করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মফঃস্বল হইতে যে সকল মহিলা কর্ম্মী আসিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের সৃষ্টি হয়। প্রথমে উহা ভবানীপুরে দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার অন্যতম সহকারী শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদাব মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখাইলেন, তখন তাঁহার উপরেই নারীকর্ম্মমন্দিরের ভার অর্পিত হয়, এবং উহা কলিকাতার সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়।

সেই ব্রাহ্মণ বধূটী স্বামী ছাড়িয়া আসিবার পর আর গৃহে যান নাই—কলিকাতাতেই থাকেন। নব প্রণয়ীর সহিত অবৈধ সংসর্গের ফলে তাঁহার গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ দেখা যায়। তখন দেশ কর্ম্মী যুবকটী সেই বধূটীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যাঁহারা এই অবৈধ প্রণয়ে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এবিষয় জানান। কারণ যুবকটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

কর্ম্মীদলের মধ্যে নারী পুরুষের এই প্রকার কলুষিত

সম্মিলনের অনেক ঘটনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জানিতেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, আর কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না, নীতিহীনতার জন্য চরিত্রবান কয়েকটি বিশিষ্ট কর্ম্মী চলিয়া গেলেন, তখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল—দেহ ভাঙ্গিয়া পরিল—স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। অর্থলোভী কর্ম্মীগণ তাঁহার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থশোষণ করিতে লাগিল, তদুপরি এই দারুণ আঘাত পাইয়া তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শবদেহ লইয়া যে বিরাট শোক যাত্রা হইয়াছিল তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমাদের পল্লী হইতে পতিতাগণ গিয়াছিল। আমি যাই নাই। কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম দেখুন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরাই মেরেছি। তার অকাল মৃত্যুর জন্য আমরাও দায়ী। দেশ সেবার ছল করে আমরা তাঁহার কর্ম্মীর দলের স্তরে স্তরে পাপের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছি। জীবিত অবস্থায় এইভাবে তাঁহাকে আমরা আঘাত করেছি। আজ মৃত্যুর স্পর্শে যখন তিনি বিশুদ্ধ হ'য়ে স্বর্গে চলেছেন, তখন আর আমার মত পতিতার পাপ দৃষ্টি যেন তাঁহার পবিত্র মুখের উপরে না পরে।" এই ভাবিয়াই আমি দেশবন্ধুকে শেষ দেখা দেখি নাই।

এখন সেই ব্রাহ্মণ বধূটী তাহার প্রণয়ীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নাকি সন্তান জন্মিয়াছে। সমাজে তাঁহারা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে চলিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী উচ্চ শিক্ষিত দেশকর্ম্মী যুবক এইরূপে পরদার গ্রহণ করিয়া সমাজে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন—এখন রাজ দরবারেও তাঁহার উচ্চ আসন। হায় সমাজ, পুরুষেয় বেলায় তুমি অন্ধ!

পিকেটিং করিবার সময় পুলিশ মহিলা কর্ম্মীদেরও গ্রেপ্তার করিত। একবার শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুক্তা বগলা সোম প্রভৃতিকে থানায় নিয়া সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমরা পুলিশকে ভয় করিতাম না। কারণ ঘাঁটির পাহারাওয়ালা হইতে পুলিশের উচ্চ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকে। আমাদের কয়েক জনকেও পুলিশ ধরিয়া থানায় নিয়াছিল। সেখানে প্রধান কর্ম্মচারী আমাকে দেখিয়াই একটু মুচ্‌কি হাসিলেন। দেখিলাম তিনি আমার পরিচিত। বিখ্যাত অভিনেত্রী নীরদা সুন্দরীর গৃহে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। কলিকাতার মধ্যে সকলেই এই ব্রাহ্মণ বংশীয় পুলিশ কর্ম্মচারীকে ভালরূপ জানেন। বলা বাহুল্য তিনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে উত্তর বঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। বন্যা-বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় নানাপ্রকারে চাঁদা তোলা হইতে থাকে। ইহার জন্য এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ছাত্র ও যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল—ধনী লোক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বহু অর্থ দান করিলেন—থিয়েটার ও বায়স্কোপ কোম্পানীর মালিকেরা বেনিফিট্ নাইট্‌এর বন্দোবস্ত করিলেন;—ছোট ছোট ক্লাব ও নানাপ্রকার সমিতি অভিনয়াদি আমোদ-প্রমোদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন, গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ও সাহায্যের জন্য সামান্য টাকা মঞ্জুর হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্য কর্ম্ম ক্ষেত্রে নামিয়া

আমাদের সাহস বাড়িয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা উদাসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার গঠিত ছিল। তবে এবারে উহাকে আরও বড় করিতে হইল। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা গলি, রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহেরীটোলা, জোড়াসাঁকো, সিমলা, কেরাণীবাগান, প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতার অধিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক এক দলে প্রায় ৫০।৬০ জন পতিতা নারী—তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রংয়ের লালপাড় সাড়ী—এলো চুল পিঠের উপরে ছড়ান—কপালে সিঁদূরের ফোঁটা—কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত—মনোহর চলনভঙ্গী, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট্ ও হারমনিয়ম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে তুইটী নারী এক খানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন্ পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে অপর তুই নারী একখানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতাগণ টাকা পয়সা নোট্ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর তুইজন স্ত্রীলোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই যে খুব সুন্দরী তাহা নহে, তবে তাহারা সকলেই নিতান্ত কুৎসিত একথাও সত্য নয়। যাহা হউক, সাজিয়া বাহির হইলে পতিতা নারীদের সকলকেই সুন্দরী দেখায়। কারণ, ইহার উপরেই তাহাদের ব্যবসার ভিত্তি। রূপ দেখাইয়া

Wanting page - 129 to 136

জন-সাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বেশ্যাদের দাঁড়াইবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে তাহাদিগকে পুলিশে বাঁধিয়া নেয়। প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহারা তাহাদের দরজার চৌকাঠের বাহিরে আসিতে পারে না। সুতরাং, খাঁটি বেশ্যা পল্লীতেও তিন চারিটী স্ত্রীলোককে কদাচ রাস্তার উপরে এক সঙ্গে দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি বেশ্যারা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহা সাধারণ লোকের চক্ষে কেমন লাগে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্য অসংযম ও ভোগ লালসার মধ্যে থাকাতে পতিতা নারীদের চরিত্রে কুভাবই প্রবল থাকে। অসহযোগ আন্দোলনে দেশপ্রীতির ভাব, অথবা বন্যা-পীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্য্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে বিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের সম্মুখে জাহির কবিবার একটা সুযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এইমাত্র। সকলে না হউক অন্ততঃ অনেকে।

আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম তখন শত শত লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্যা-পীড়িত দুর্দ্দশা-গ্রস্থ নরনারীর দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া, তাহারা মুগ্ধ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকদের দলে এত লোকের ভিড় হইত না।

সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই পতিতা নারীর দল অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। আমরা বহু সহস্র টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু

Wanting page

নানা অপব্যয় করিবার পর তাহার অংশ বিশেষ মাত্র কেন্দ্রীয় সমিতির তহবিলে পৌঁছিয়াছে। আমরা যাহা কিছু দিয়াছি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের টাকা লইতে সুনীতিবাদী ব্যক্তিদের আপত্তি ছিল; কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া মত করিলেন।

ক্রমশঃ আমরা ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের যুবক ও কুলবধুদের সহিত মেলামেশা করিবার অধিক সুযোগ পাইতে লাগিলাম। অবশ্য পূর্ব্বেও যে তাহা ছিলনা এমন নয়। দ্বাদশ গোপাল, তারকেশ্বর, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে ও মেলায় আমাদের অবাধ গতিবিধি ছিল, এখনও আছে। তাহাতেও সমাজের কিছু অবনতি ঘটিতেছে। তবে সে সকল স্থলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকে—পতিতা নারীদের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার বিশেষ প্রলোভন অথবা অবসর কাহারও ঘটেনা। কিন্তু এবার অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে ভাবে বাহির হইলাম, তাহাতে ভদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা প্রয়োজন বশতঃ অনিবার্য্যই ছিল। মেলায় অথবা তীর্থস্থলে জনতার মধ্যে পতিতা নারীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহারা সাধারণের চক্ষে এমন জাজ্বল্যমান হয়না। কিন্তু আমরা ভিক্ষার ছলে অথবা পিকেটিং করিবার জন্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মুগ্ধদৃষ্টি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া যাইত না।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্গত আরও কয়েকটী প্রধান বিষয় ছিল,—অস্পৃশ্যতা দূর, চরকা ও খদ্দর। আমাদের পতিতা নারীসমাজে ইহার ফল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে

বলিতেছি। অস্পৃশ্যতা দূর বলিতে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই বুঝিয়া ছিলেন যে, হাড়ী, মুচি, ডোম, চণ্ডাল, পারিয়া, দুলে, বাগদী, সাঁওতাল, দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের পরিবেশিত অন্নজল উচ্চ বর্ণের লোক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং এই সকল অন্ত্যজ জাতির লোক শুদ্ধদেহে ও পবিত্র পরিচ্ছদে দেব মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কোন কোন ভক্ত বেশ্যাদিগকেও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে 'চল' করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একথা বোধ হয় সকলেই জানেন, পতিতার গৃহে যে সকল ভদ্রলোক গমন করেন, তাঁহারা গোপনে সেই নারীর স্পৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার খাদ্যও পানীয় গ্রহণ করেন—শুধু গ্রহণ করেন বলিলে কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে—গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। যে কার্য্যটী গোপনে হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ্যে করাই এই গান্ধী-ভক্তদের উদ্দেশ্য ছিল। দেবমন্দিরে প্রবেশ বেশ্যাদের পক্ষে কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের সাজ পোষাক দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরের চমক লাগিয়া যায়—প্রচুর দক্ষিণার লোভে, তিনি—না বলিতেই দ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দেন।

পতিতাদের প্রতি এই অপূর্ব্ব সহানুভূতির ফলে নানাস্থানে পতিতা নারীসঙ্ঘ স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে বরিশালের বেশ্যা-সমিতিই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার বন্ধু কালীদাসীর বাড়ীতে বরিশাল হইতে একটী বারবণিতা আসে। তাহার নাম এখন ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় বসন্তকুমারী হইবে। যাহা হউক, এই বসন্তকুমারীকে লইয়া এক তরুণ ছাত্র-যুবক

কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটী কোন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। বাপের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া আটশত টাকা লইয়া পতিতা-প্রণয়িনীকে কলিকাতায় আনিলেন। বসন্তকুমারীর মুখে শুনিলাম, বরিশালের একজন বিখ্যাত দেশকর্ম্মী দার্শনিক ব্যক্তি তরুণ যুবকদের দ্বারা পতিতালয়ে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। তথাকার বারবণিতাগণ চরকায় সূতা কাটিতেছে ও খদ্দর পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। আমি এত উৎসাহিত হইলাম যে আমিও একটা চরকা কিনিয়া ফেলিলাম—খদ্দরের সাড়ী ব্লাউজ পরিতে লাগিলাম।

আমার চেষ্টায় রামবাগানে দশ বার জন পতিতা নারী চরকায় সূতা কাটীতে লাগিল। কেহ কেহ খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুইমাসের মধ্যেই সব শেষ। চরকা খদ্দর বন্ধ হইয়া গেল। তা' হইবারই কথা—কারণ সংযম ও পবিত্রতার ভিত্তি ব্যতীত উহা দাঁড়াইতে পারে না।

একদিন দেখিলাম কোন খবরের কাগজে লেখা হইয়াছে—"কি দুঃখের বিষয়—অশ্বিনীকুমারের বরিশালে আজ যুবকেরা পতিতার সংস্পর্শে যাইতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না।" আমি বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তোমাদের বরিশালে অশ্বিনীকুমার কে?" বসন্ত বলিল "আমি তিনমাস পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে বরিশালে আসি। অশ্বিনীকুমারের পরিচয় আমি জানিনা—উনি বোধ হয় জানিতে পারেন।" বসন্ত তাহার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। যুবকটী পার্শ্ববর্ত্তী পালঙ্কের উপর শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিকৃত স্বরে গাহিতেছিলেন—

"এখনও তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশী শুনেছি।
মন প্রাণ যা' ছিল তা' দিয়ে ফেলেছি"।—

বসন্তের কথায় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অশ্বিনী বাবুর নাম শুনেন নি।—স্বনামধন্য পুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত। আপনি এত পড়াশুনা করেছেন—তাঁর ভক্তিযোগ পড়েননি ?—একবার পড়ে দেখ্‌বেন। পবিত্র চরিত্রের এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নাই! অশ্বিনী বাবুর হাতে গড়া বরিশাল।" আমি বলিলাম "সেই অশ্বিনী কুমার দত্ত! হাঁ, তাঁর নাম আমি জানি।"

আমি তাঁর মুখের উপর জবাব দিলাম "আপনিও সেই বরিশালেরই যুবক—না ? যুবকটী নির্লজ্জের মত পুনরায় গাহিতে লাগিল—

"শুধু স্বপনে এসেছিল যে,
নয়ন কোনে হেসেছিল সে"—

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল, মানুষ এত বড় ভণ্ড হইতে পারে—একটা মহান আদর্শকে প্রসংশা করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্য্য দ্বারা অম্লানবদনে তাহাকে পদদলিত করিয়া যায়। যাহা হউক, বসন্তের প্রণয়ী এই যুবকটী আমাকে একদিন, অশ্বিনী বাবুর 'ভক্তিযোগ' পুস্তকখানি আনিয়া দিলেন। বলিলেন ইহা আমার উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুণ।" সেই অবধি আমি ভক্তিযোগ মাঝে মাঝে পাঠ করিতাম।

এই পতিতা-নারী-সমিতির প্রভাব ক্রমশঃ এতদূর বিস্তৃত হইল যে একদল সুনীতি-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রথমাবধি

ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। ঐ সংবাদ পত্রে তিনি চিরদিন এই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিমাচলের মত দৃঢ় চিত্ত এই মহাপুরুষকে আমি জীবনে কয়েকবার মাত্র দেখিয়াছি; তাহাতে তাঁহাকে দেবতা সদৃশ বলিয়া আমার মনে হইয়াছে—তাঁহার কথা আমি আর ও দুইটী পতিতা নারীর মুখে শুনিয়াছি—তাহাদের নাম সুরুচি ও উষাবালা। যথাস্থানে ইহাদের কথা উল্লেখ করিব।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে এখানে আরও দুই একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাঁহার সুনীতি ও পবিত্রতার আদর্শের তুলনায় আমরা অতি হীন—নরকের কীটানুকীট। তথাপি তাঁহার কথা এই জন্য বলিতেছি, তাহাতে আমার চরিত্র আরও পরিস্ফুট হইবে। কৃষ্ণবাবু দুর্নীতিকে কখনও কোন মিথ্যা অজুহাতে ক্ষমা করেন নাই—কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারের অভিনেত্রীদের গান শিখাইতে যান বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন—আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র পতিতার দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপরও দোষারোপ করিয়াছেন—ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ 'সরযূ-সদনের' সাহায্যার্থ বেশ্যা দ্বারা নাট্যাভিনয় করাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অজস্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন—শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী মিনার্ভা থিয়েটারে বেশ্যাদের সভায় মহিলা ভলাণ্টিয়ারদের নেত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের এক এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার সকল প্রণয়ীই ইঁহাকে ভয় করিত।

মহাত্মা গান্ধী যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি বরিশালে গমন করিলে সেখানকার পতিতা-নারী-সমিতি তাঁহাকে

দেখাইয়া স্পষ্টস্বরে একটু তিরিক্ষি মেজাজে কহিলাম
কে ?—এ সময়ে আপনার কি প্রয়োজন ?" কিন্তু আমার
কাঁপিতেছিল।

নন্দদাদার বন্ধু আমার আপাদ-মস্তক একবার দৃষ্টিপাত ক
বলিল "মানী তুমি এখানে ?" আমি বলিলাম আমার নাম ফি
বিবি,—।" নন্দদাদার বন্ধু ভিতরে আসিয়া বিছানায়
লাঠিটি সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিল। আমি দাঁড়াইয়া ছি
নন্দদাদার বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া বলিল "বসন
খানে !" আমি যন্ত্র চালিতের মত বসিয়া পড়িলাম। মাথা
করিয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিলাম। নন্দদার বন্ধুর নাম উ

নন্দদাদার বন্ধু আমাকে বলিল "মানী, তুমি শেষে
করিলে ?—পড়াশুনার এই পরিণাম ?" আমি নন্দদার বন্ধুর
ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, "কাল রাত্রিতে
দোকানে পিকেটিং কর্‌তে এসে তোমার চাকরের মুখে ফিরোজা
ঠিকানা পেয়েছি। আমরা মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ম
রহিত কর্‌তে প্রতিজ্ঞা করেছি। বেশ্যাদের ঘরেও আমরা এই
যাই। আজ ফিরোজা বিবির ঘরে আস্‌বার কাজ আমার
পরেছিল। এখানে এসে দেখ্‌লাম সে আমারি পরিচিতা ;
তা'হলে আজ থেকে তোমার ঘরে মদ আসা বন্ধ,—মনে রে

উপেন বাবুর নিকট বাড়ীর সমস্ত সংবাদ জানিলাম।
মনোদুঃখে কলিকাতার সমস্ত বাড়ী বিক্রয় করিয়া পল্লীগ্রামে
বাস করিতেছেন। আমার মামার (নন্দদার পিতার) মৃত্যু হই
নন্দ দাদা গান্ধীর আন্দোলনে মজিয়াছে। মুকুলদা বি

......কোর্টে প্র্যাকটিশ করিতেছেন। তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চায় বেশী মন থাকায় অর্থোপার্জ্জন কিছুই হয় না। কমলা ক পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িবার জন্য পশ্চিমে কোথায় ছ। তাহার মাতা কলিকাতার বাড়ী ছাড়িয়া এখন কমলার ই সেখানে থাকেন। নন্দদাদা তখনও বিবাহ করেন নাই। আমি তাহাকে মাঝে মাঝে আসিতে অনুরোধ করিলাম। উপেন বলিলেন "তোমার কাছে যে উদ্দেশ্যে আসা, তা'ত হয়ে গেল। মদ কিন্‌বেনা, বাস্, আর ত কোন প্রয়োজন নাই।" উপেন বাবু া হইতে উঠিলেন। আমি তাহাকে কিছু খাইবার জন্য কত : করিলাম, কিন্তু তিনি কিছু খাইলেন না—একটা পান পর্য্যন্ত এমন চরিত্রবান যুবক কর্ম্মী ও আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, । পাপীর সংস্পর্শে আসিয়াও পাপ হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছেন।

ার ঘরে আর মদ আসিত না। বাবুর বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট হইলেন—রাগ করিলেন। উপেন বাবুর কাছে আমি চিঠিপত্র লিখিতাম—হার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিত। আমার বাবু ইহা সন্দেহের চক্ষে দেখি-সুতরাং আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। ন্দদাদার এই বন্ধুটী আমার পরিচিত। বাল্যকালে তাঁহাকে র বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি নন্দদাদার প্রতিবেশী র সম্পর্কিত আত্মীয়। নন্দদাদাকে আসিবার জন্য নিকট অনেকবার বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার এই । শুনিয়া আর আমার নিকট আসেন নাই।

তিন মাসের মধ্যেই আমার এই পাধ্যায় বাবু আমাকে ছাড়িয়া অভিনেত্রীর সহিত তাঁহাকে হাস্য পরিহাস করিতে দেখিয়া-

ছিলাম, তাহারই ঘরে তিনি যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন ব্যাঙ্কের টাকায়ই নটীর পূজা আরম্ভ হইল। অপব্যয়ের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেল্ হইল। তিনি নিজেও গেলেন, দেশের লোকেরও সর্ব্বনাশ। অনেক ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের আজীবন সঞ্চিত ধন, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায়, তাঁহারা ভিখারী সাজিয়াছেন। আপনারা মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। কোনও পুরাতন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাও তাহার ম্যানেজারের বেশ্যাশক্তির ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি মনে করিলাম আর কাহারও নিকট বাঁধা থাকিবনা। ভাল গায়িকা বলিয়া আমার সুনাম ছিল—আমি সোণাগাছিতে উঠিয়া গেলাম। এইখানে রাজসাহী জেলার কোন জমিদার যুবক আমার গৃহে আসিতেন। তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যাইতাম। একদিন বক্সে বসিয়া আছি—জমিদার বাবুটি অতিরিক্ত মদ্যপানে একটু মাতলামি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না—বাবুর শাশুড়ীটি নিকটবর্ত্তী আর এক বক্সে বসিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ব্ববঙ্গের কোন বিশিষ্ট জমিদার গৃহিনী। জামাতার এইরূপ লজ্জাজনক আচরণ দেখিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে জামাতাকে তখনি নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এখন সেই জমিদার বাবুটী সত্যবালা নাম্নী আমার পরিচিতা এক পতিতার ঘরে যান। সমাজে তাঁর মান মর্য্যাদা যথেষ্ট।

আমি মাঝে মাঝে বড়লোকের বাগান অথবা মজলিসে গানের মুজরায় যাইতাম। ইহাতে অর্থোপার্জ্জন হইত বটে, কিন্তু বিপদও ছিল। বড়লোকের খেয়াল মাফিক চলা যে কি বিরক্তিজনক, তাহা

বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সারারাত্রি জাগরণ, ভালবাসার ভান, মাতলামির ঝঞ্ঝাট—এই সব করিতে করিতে শরীর মন একবারে অবসন্ন হইয়া পরিত। ভাবিতাম—আর না, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলি। হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইত। কিন্তু প্রলোভন কখনও জয় করিতে পারি নাই—বার বার ঘূর্ণিপাকে পরিয়াছি।

১৯২৪ সালের বর্ষাকালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান মহান্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে পূর্ব্বাবধি নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ ছিল। তদনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট রিসিবার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে মহাবীরদল রিসিবারের মন্দির প্রবেশ বাধা দেন। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসীদল প্রবেশাধিকার দাবী করেন। তাঁহারা বলেন মহান্তের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রাসাদের মধ্যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহা দর্শন ও পূজা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই গোলযোগের মধ্যে মহাবীরদল, গবর্ণমেণ্ট, মহান্ত, কংগ্রেস সকলে জড়াইয়া পরিল। মারামারি, লুটপাট, প্রভৃতি তুমুল কাণ্ড চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রায় দশ বার জন পতিতা নারী তারকেশ্বরে যাত্রা করি। সেখানে যাইয়া দেখিলাম হুগলী, শ্রীরামপুর, নোনাডাঙ্গা, সেওড়াফুলি প্রভৃতি স্থান হইতে আরও বেশ্যা আসিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া মহিলা-ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিলাম। সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবার জন্য আমরা কিছু টাকা চাঁদাও তুলিয়াছিলাম।

মহান্তের প্রাসাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিতে কংগ্রেসীদল আমাদিগকে দিলনা। মন্দির রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য হইল। স্বামী সচ্চিদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিলে আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম। পুলিশ বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। আমরা পালা করিয়া মন্দিরের দ্বারে প্রহরির কার্য্য করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ও শ্রীযুক্তা সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ইঁহারাই তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহের প্রধান পরিচারক ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন যাইয়া আমাদের সকলকে উৎসাহিত করিয়া আসেন। আমাদের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। সত্যাগ্রহ তহবিলে বহু সহস্র টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। যথাসময়ে তারকেশ্বর সমস্যার একপ্রকার মীমাংসা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সেখানে সে বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। মহিলা ভলাণ্টিয়ার নামধারী বেশ্যাদের সহিত বিভিন্ন দলের ভলাণ্টিয়ার নামধারী অনেক ভণ্ড লম্পটের অবাধ কলুষিত সংযোগ—যাঁহারা দেশকর্ম্মী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কাহারও রাত্রিযাপন সমস্যা—আমার নিকট কোন সত্যাগ্রহী ব্যক্তির প্রস্তাব—এই সব দেখিয়া মনে হইয়াছে, তারকেশ্বরে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তথায় পুণ্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছে।

সেখানে দেবদর্শনার্থী সুকৃতি নাম্নী এক যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হয়। সাবিত্রী নামে সুকৃতির এক ভগ্নী ছিল। ইহারা কলিকাতার জোড়াসাঁকো পল্লীর বিখ্যাত উচ্চ বংশের কন্যা। লোক বলে এই বংশে লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ নাই। সুকৃতি ও সাবিত্রী

উভয়েই পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সোনাগাছিতে বাস করে। গবর্ণমেণ্টের একজন উকীল সুকৃতির ঘরে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে সাবিত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। একজন বড় দেশকর্ম্মী তাহার কাছে যাইত। যে সকল পরিবার বাংলার গৌরব, তাহাদেরও আজ এ কি অধঃপতন! ইহার নিকট বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির যে ইতিহাস শুনিয়াছি তাহা লিখিলে হয়ত আইনের দায়ে পরিতে হবে—এজন্য লিখিলাম না। এই পরিবারই অবাধ মেলামেশার পথ প্রদর্শক।

উপেন বাবুর নিকট শুনিয়াছি নন্দদার সংযম অটুট রহিয়াছে। কোন নারী তাহার সম্মুখে প্রলোভন লইয়া আসিতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ভাল দিকটা তাহার পূর্ব্ব-গঠিত চরিত্রকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। বিলাসশূন্যতা ও সৎকার্য্যে আসক্তি এই দুইটী তাহার ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সহায়। আমার মত সাহিত্য চর্চ্চা না করা নন্দদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। দারিদ্র্য তাহার বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে। এমন নির্ম্মল চরিত্রের কর্ম্মীও আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প।

আমার সম্বন্ধে নন্দদাদা নাকি এই কথা বলিত "মানদা যদি তা'র পাপজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এক বস্ত্রে আমার কাছে আসে, আমি তাকে আদরের সহিত মাথার মণি ক'রে রাখ্‌ব—বোন্ ব'লে তেমনি স্নেহ করব। কিন্তু সে পতিতা-পল্লীতে—পতিতাবৃত্তিতে থাকিলে আমি তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে পারি না।"

আমি কখনও সিগারেট অথবা মদ খাই নাই। পতিতা নারীদের এই অভ্যাস অর্থোপার্জ্জনের অনুকূল নহে। আমার বাবুগুলি আমাকে এই নেশা দুইটী ধরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু

কেহই সফলকাম হন নাই। উপেন বাবু মদ্যপান নিবারণের জন্য বেশ্যাদের গৃহে পিকেটিং অনেক দিন চালাইয়াছেন। আমি যথা সাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছি।

পূজার ছুটী, বড়দিনের অবকাশ প্রভৃতি উপলক্ষে মফঃস্বলের উকীল ও আফিসের কর্ম্মচারিগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। তখনই আমাদের গৃহে তাঁহাদের অনেকের শুভাগমন হয়। যাঁহারা জমিদার ও ব্যবসায়ী তাঁহারা অন্য সময়েও আসিতে পারেন। অনেকে মফঃস্বল হইতে এখানে তাঁহাদের রক্ষিতাদিগকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। নোয়াখালীর এক রায়-বাহাদুর, বর্দ্ধমানের এক জমিদার, ঢাকার এক বড় ঔষধ ব্যবসায়ী, রংপুরের এক উকীল ইহাদের নিকট হইতে আমি মাসিক কিছু টাকা পাইতাম। চীৎপুরে বিশিষ্ট সোণার বেণের মেয়ে প্রভা নামে আমার এক বন্ধু আছে। ময়মনসিংহের একজন উকীল তাহার বাবু, ঢাকার সেই ব্যবসায়ীর সহিত ইহার নাকি পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঢাকার লোকটী আমার ঘরে আসিত। প্রভার বাড়ীতে কলিকাতার এক ব্যারিষ্টারের কুমারী কন্যাও আছেন। এইরূপে নিত্য নূতন লোক লইয়া সোনাগাছীতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। বিশিষ্ট ঘরের পতিতা মেয়েদের সঙ্গে আমি একটু বেশী মেলামেশা করিতাম। এই ব্যারিষ্টার কন্যার মত নির্ভিক পতিতা আমি কম দেখিয়াছি।

এই সময়ে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ হইল। আমি এস্থলে তাহার বর্ণনা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে, কি ঘোরতর পাপ সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে তাহাও সমাজপতিদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার মধ্যভাগে বাদুড়বাগান পল্লীর নিকট এক জমিদার বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নাকি সুপরিচিত বিখ্যাত ব্যক্তি। সেই জমিদার অতিশয় দুশ্চরিত্র। প্রতিবেশী গৃহস্থদের কুলবধূর উপর তাঁহার কুদৃষ্টি। তাঁহার দুষ্কার্য্যের সহায় কতকগুলি বন্ধু ও অনুচর আছে। ইহারা নানা কৌশলে গৃহস্থদের কুলবধূদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া প্রভুর কাম-লালসা তৃপ্তির জন্য লইয়া আসে। কখনও কলিকাতার প্রাসাদে, কখনও বা নিকটবর্ত্তী বাগান বাড়ীতে এই সকল পাপলীলার অনুষ্ঠান হয়।

গৃহস্থের কুলবধূরা কেহ প্রলোভনে স্বেচ্ছায় কেহ বা অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া আসিয়া থাকে। তাহারা অনেকেই গান জানে না, মদ্য পান ও করে না। এই প্রকার আমোদের জন্য সোনাগাছী অথবা রামবাগান হইতে পতিতা নারীদিগকে নেওয়া হইত। আমি এই জমিদারের বাগান বাড়ীতে দুই একবার গিয়াছিলাম। প্রতিরাত্রিতে এক শত টাকা লইতাম—গান গাওয়াই আমার কার্য্য ছিল। আমি মদ খাইতাম না। আরও দুই তিনটী বেশ্যা যাইত। তাহারাই মদ্য পানের আমোদে যোগ দিত।

একরাত্রিতে জমিদারের বাগান বাড়ীতে আমার যাইবার ডাক পরিল। আমি আমার পাওনা টাকাকড়ি অগ্রিম লইয়া রাত্রি আটটার সময় তথায় যাই। দেখিলাম, একটী সুন্দরী যুবতী কুল-বধূকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮।১৯ এইরূপ হইবে। গায়ের রং যেন কাঁচা সোণা—মুখখানি কোমল, লাবণ্য-মাখা। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল। এই দুর্বৃত্ত জমিদারের পাপ প্রবৃত্তির কবলে কত সতীর বলিদান দেখিয়াছি। আমরাও

এই পাপের ভাগী। সে রাত্রিতে নাকে আমার মন লাগিল না। আমি এই বধূটির সহিত কথাবার্ত্তার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ হইল। জমিদার ও তাঁহার বন্ধুগণ মদ্যপান করিতে লাগিলেন। আমি দুই একটি গান গাহিলাম। অন্যান্য বেশ্যারাও তারপর নাচিতে গাহিতে আরম্ভ করিল। আমি গরমের অছিলায় বাহিরে আসিবার সময় সেই বধূটিকে আস্তে আস্তে বলিলাম "চল, একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি। আমরা উভয়ে পুকুরের ঘাটে একটি বেদীর উপরে বসিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইল। তাহার সার মর্ম্ম এই— বধূটীর নাম অপরাজিতা দেবী। সে ব্রাহ্মণ কন্যা। বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে তাহার পিত্রালয়। কলিকাতার কোন মুখোপাধ্যায় যুবকের সহিত নাকি বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী পিসিমার কাছে থাকেন। এই পিসিমায়েরা কয়েক ভগ্নি, নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করেন। তাহার স্বামীর পিতামাতা বা, পর কোন আত্মীয় স্বজন বোধ হয় নাই। তিনি অতি নিরীহ ও শান্ত স্বভাব। সর্ব্বদা পিসিমার মন যোগাইয়া চলেন। পিসিমার মৃত্যুর পর বাড়ী ও নগদ টাকা নাকি পাইবেন, ইহা তাঁহার আশা ছিল।

অপরাজিতার পিসশাশুড়ী নাকি বিধবা অবস্থায়......... অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, এইরূপ দুর্ণাম আছে। এক্ষণে বার্দ্ধক্যে নিজে অশক্ত হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্রের বধূদের সতীত্বের বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন। অপরাজিতার স্বামীর পূর্ব্বে আরও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। পর পর সে দুইটি বধূর অগ্নিদাহে মৃত্যু

হয়। পিস্‌শাশুড়ী প্রকাশ করেন যে, বধূরা নিজের দেহে আগুণ লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অপরাজিতা তাহার স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—তাহার একটী শিশুপুত্র আছে।

অপরাজিতাকেও তাহার পিস্‌শাশুড়ী পাপ পথে অর্থ উপার্জ্জন করিতে নিযুক্ত করেন, অপরাজিতা তাহাতে সম্মত হয় না। ইহাতে পিস্‌শাশুড়ী তাহার উপর দিবারাত্রি উৎপীড়ন করিত। একটা দুষ্ট ডাক্তার পিস্‌শাশুড়ীর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও দুষ্কার্য্যের সহায় ছিল। অপরাজিতা এতদিন তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

আমি অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখন কি করবে?—তুমিও কি আত্মহত্যা করতে চাও?" অপরাজিতা বলিল, "আত্মহত্যা করব কেন?—আমার বাবা আছেন—ভাই আছেন—আমার ছেলে আছে—আমি আত্মহত্যা করব না। তবে ঐ লম্পটের হাতে আমি সতীত্ব কিছুতেই দিব না, আমার প্রাণ যায়,—তাও স্বীকার।" আমি এই কিশোরী বধূর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও অপূর্ব্ব আত্ম-সংযম দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। এই বালিকা কোন শিক্ষা পায় নাই—লেখাপড়া জানে না, সাহিত্য চর্চ্চা করে নাই, অথচ ইহার মধ্যে এমন তেজ ও শক্তি কোথা হইতে আসিল?

আমি বলিলাম "তুমি যদি ইহাদের কুপ্রস্তাবে সম্মত না হও, তবে কি হবে তা জান?" অপরাজিতা বলিল, "হাঁ জানি। এরা আমাকে মেরে ফেল্‌বে। আমার পিস্‌শাশুড়ী আমার ঐ দুই সতীনকেও মেরে ফেলেছেন, তারপর লোকের কাছে বলেছেন যে,

টইহারা কাপড়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন লাগিয়ে মরেছে। কিন্তু মানুষ এত বোকা নয় যে সে কথা আর বিশ্বাস করবে; র পর দুইটী বৌ একই রকমে মারা যায়। আজ সারাদিন পিস্‌শাশুড়ীর সহিত আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিব। শাশুড়ী আমাকে বলেন তাহ'লে তোর গলায় পা দিয়ে একেবারে তোর জীবন শেষ করব।' আমিও সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, ওরা জীবিত অবস্থায় যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।"

অপরাজিতার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মাথা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। ভাবিলাম, অপরাজিতা কোন স্বর্গের দেবী—আর আমি কোন নরকের কীট। হিন্দু সমাজে কেবল আমার মত কলঙ্কিনীই জন্মগ্রহণ করে না, অপরাজিতার মত সতীও জন্মগ্রহণ করেন। আমার দেহের দূষিত বাতাসে অপরাজিতার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে—এই ভাবিয়া তাহার সহিত আর অধিকক্ষণ কথা কহিলাম না। দেখিলাম, তাহার পিস্‌শাশুড়ী ও আর একজন লোক (অপরাজিতা বলিল, লোকটী নাকি......... ডাক্তার) সেইদিকে আসিতেছেন। আমি অপরাজিতার পায়ের ধূলা নিয়ে তাহাকে প্রণাম করিলাম। সে অগ্রসর হইয়া গেল—আমি একটা লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইলাম।

সে রাত্রিতে আমি আর আমোদ প্রমোদে যোগ দিলাম না। শরীর অসুস্থ বলিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিলাম। দুঃস্বপ্নে ভাল ঘুম হইল না। দুইদিন পরে খবরের কাগজে পড়িলাম, অপরাজিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিস্‌শাশুড়ী পুলিশের নিকট

জানাইয়াছেন, সকালবেলা উনুনে আঁচ্ ধরাইবার সময় অসাবধানে কাপড়ে আগুন লাগিয়া অপরাজিতার মৃত্যু ঘটে। শবদেহের ডাক্তারী পরীক্ষায়, পুলিশ তদন্তে ও করোনারের বিচারে প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইল না। এই ঘটনার প্রায় সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আমি নিতান্ত মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তিতে কাটাইয়াছি। এখনও অপরাজিতার মুখখানি আমার মনে আছে।

এদেশের ঘরে ঘরে এমন কত শোচনীয় দুর্ঘটনা হইতেছে, সে সংবাদ কি সমাজের কর্ত্তারা রাখিয়া থাকেন?—সতী-শিরোমণি বালিকাবধূর অভিশাপে সমাজ রসাতলে যাইতেছে। দুর্বৃত্ত লম্পটেরা অর্থের বলে মান মর্য্যাদা আদায় করিয়া সমাজের মধ্যে নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া বেড়ায়।

কালীদাসী একদিন আমার বাড়ীতে আসিল। তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, রেস্ (ঘোড়-দৌড়ের জুয়াখেলা) খেলিয়া এবং মদ খাইয়া তাহার সেই ভাটিয়া বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার কারবার উঠিয়া গিয়াছে। কালীদাসী এখন এক মাড়োয়ারীর কাছে বাঁধা। কিন্তু হাতে টাকাকড়ি নাই। আমার কাছে গহনা বন্ধক রাখিয়া পাঁচশত টাকা কর্জ্জ চায়।

যাহারা পতিতালয়ে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের দুইটী প্রধান নেশা জন্মে—ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা এবং মদ্যপান। রেস্ খেলিয়া অনেকে হাজার হাজার টাকা পায়—এইরূপ শুনা যায়—কিন্তু তাহা থাকে না; যে পথে উৎপত্তি, সেই পথেই নিষ্পত্তি। রেসের দিন বেশ্যা

পল্লীতে খুব ভিড়। যে খেলায় জিতিয়া কিছু লাভ করিয়াছে, সে যেমন আমোদ করিতে সেখানে যায়—যে হারিয়া সমস্ত খোয়াইয়াছে সেও তেমনি দুঃখ ভুলিতে সেখানে ছুটিয়া যায়।

আমার হাতে টাকা ছিল না। উষাবালা নামে একটী স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীতে নূতন আসিয়াছিল। তাহার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে জানিতাম। কালীদাসী যে গহনা আনিয়াছিল, তাহার মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা। সুতরাং আমার কথায় সম্মত হইয়া উষাবালা ঐ গহনা বন্ধক রাখিয়া কালীদাসীকে পাঁচ শত টাকা দিল।

আমি পরে জানিয়াছি, কালীদাসী রেস্ খেলিয়া ও মদ খাইয়া সেই টাকাও উড়াইয়াছে। ভাটিয়া বাবুর সংসর্গে কালী-দাসীকে রেস্ ও মদের নেশায় পাইয়াছিল। এই পথেই সে উচ্ছন্ন গিয়াছে। আমি আরও জানিলাম, এই নূতন মাড়োয়ারী যুবকটীর সহিত কালীদাসীর পূর্ব্ব হইতেই গুপ্ত-প্রণয় ছিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রহিল না। উষাবালার টাকা সে পরিশোধ করিতে পারে নাই।

কালীদাসী এখনও বাঁচিয়া আছে। সে আমারই মত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে কলিকাতার কোন অপরিচ্ছন্ন বস্তীতে এক বিড়ীওয়ালা মুসল-মান যুবকের সহিত যেভাবে ইয়ারকি করিতে দেখিলাম—তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি, পতিতাদের শীঘ্র মরণ হয় কেন। সেই ২৬ বৎসরের যুবতীর দেহ ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের মত ক্ষীণ শুষ্ক অস্থি চর্ম্ম সার; মদ্যপানের ফলে নানারোগের আক্রমণ,

পরণের একখানা কাপড়ই যথাসর্ব্বস্ব—দুইবেলা আহার জুটে না—তার উপর অত্যাচার। আমি কালীদাসীর সহিত কথা কহিলাম না। মোহান্তজীর উপদেশ আমার মনে হইল— "দৈবকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। কর্ম্মফলই দৈব।"

ঊষাবালার কথা এইখানেই বলিব। সে ফরিদপুরের কোন ব্রাহ্মণ উকীলের পরিণীতা স্ত্রী। পিত্রালয় হইতে কয়েকজন ধনী মুসলমান অপহরণ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলিয়াঘাটায় রাখে। নারী-রক্ষা-সমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্ম্মীদের দ্বারা ও পুলিশের সাহায্যে ঊষাবালাকে উদ্ধার করেন। এইজন্য পুলিশ-আদালতে মামলা চলিতে থাকে। তাহার স্বামী তাহাকে স্ত্রী বলিয়া অস্বীকার করেন। ঊষাবালা কিছুদিন সঞ্জীবনী সম্পাদক, নারী-রক্ষা সমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করে। এই ঊষাবালার কথাই আমি পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। সে আমার নিকট বলিয়াছে "কৃষ্ণ-কুমার মিত্র মহাশয় আমাকে নিজ কন্যার মত দেখ্‌তেন। তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা কর্‌লেন, শিল্প কাজ শিখবার জন্য এক স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। কিন্তু আমি কিছু-তেই মনস্থির করতে পারলাম না। দুঃপ্রবৃত্তি দমন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে উঠল। আমার বয়স আঠার বৎসরের বেশী— সুতরাং তাঁরা আমাকে আর জোর করে রাখ্‌তে পারেন না। নানা অবস্থার পাকে চক্রে ঘুরে আমি এই পথে এসেছি। কিছু-দিন আমাকে রাস্তায় বসে পান বিক্রীও করতে হ'য়েছিল।"

নারী নিগ্রহের বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হইলে, আমি এক-জন ভদ্র লোককে প্রায়ই বেশ্যাদের ঘরে আসিতে দেখিতাম, তিনি আমাদের নিকট তারকবাবু নামে পরিচিত, পতিতাদের মধ্যে চারি পাঁচজন তাঁহার বিশ্বাসভাজন ছিল, আমাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমরা ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি কোন কুমতলবে বেশ্যালয়ে আসেন না। তিনি নারীরক্ষা সমিতির কর্ম্মী—না পুলিশের গোয়েন্দা, তাহা জানি না, কিন্তু আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অনেক দুর্ব্বৃত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে বৌকে চুরি করিয়া বেশ্যা-গৃহে লুকাইয়া রাখে—কোন স্ত্রীলোক কলঙ্কের ভয়ে বাধ্য হইয়া প্রণয়ীর সহিত স্বেচ্ছায় পতিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—এই সব সন্ধান লইবার জন্যই তিনি গোপনে বেশ্যাদের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম।

একদিন তারকবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমাদের সম্মুখের সমস্ত বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে যে নূতন মেয়েটী রয়েছে তা'র সম্বন্ধে একটু বিশেষ খোজ করে দেখ্‌বে; আমার প্রয়োজন আছে।" আমি তা'র পরদিন হইতে সেই বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটীর সহিত আমার ভাব হইল। তার ভিতরের কথা অনেকটা জানিলাম।

কয়েকদিন পর তারকবাবু আসিলে আমি বলিলাম, "মেয়েটী ব্রাহ্মণ বংশীয়া—নাম সুরুচিবালা, তাহার পিতা একজন অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, এখন কাশীতে আছেন, হুগলী জেলার কোন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত সুরুচির বিবাহ হয়। সুরুচি বলে যে তাহার স্বামী আর এক বিবাহ করিয়াছিল। সুরুচির স্বামীগৃহে

স্থান হয় নাই। সে কাশীতে পিতার নিকট থাকিত। বাল্যকাল হইতে উপন্যাস নাটক নভেল পড়ায় তাহার খুব ঝোঁক ছিল। ক্রমশঃ সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া উঠে; পিতা মাতার শাসন সে মানিত না, কাশীতে দুষ্ট লোক অনেক আছে, সুরুচি কোন দুর্ব্বৃত্তের সহিত পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসে। এখানে অনেকের হাতে পড়িয়া সে কলুষিত হয়। পুলিশ তাহাকে আপত্তিজনক অবস্থায় পাইয়া গ্রেপ্তার করে, পুলিশ আদালতে তাহাকে নেওয়া হইলে বিচারক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, নারীরক্ষাসমিতির কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী মহাশয় সেদিন অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বিচারক চিনিতেন, তিনি মহেশবাবুকে বলিলেন "আপনি এই মেয়েটীকে নিয়ে যান, নারীরক্ষা সমিতি হইতে ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করুন।"

সুরুচি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় পাইল, তিনি পিতৃস্নেহে ইহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুরুচি এই সরল-প্রাণ উদার হৃদয় মহানুভব ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া চলিয়া আসিল, দুষ্টলোকের প্রলোভনে পড়িয়া সে পাপের পথই বাছিয়া লইল। এক্ষণে এক ধনী পার্শী যুবক তাহাকে বাঁধা রাখিয়াছে, মেম-সাহেবদের ষ্টাইলে সে থাকে—ঘাড়ের উপর পর্য্যন্ত ছোট করিয়া চুল ছাঁটা—হাঁটু পর্য্যন্ত স্কার্ট, খোলা হাতের রংএর সহিত মানান সই সিল্কের মোজা,—পরিস্কার হিন্দী বলে; ইংরাজীও কিছু শিখেছে।"

তারকবাবু সমস্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন "সে কৃষ্ণবাবুর বাড়ী হইতে পলাইল কেন, তাহা বুঝি জান না। আমি

বলিলাম—না—সে কথাত সুরুচি কিছু বলে নাই। তারকবাবু বলিলেন, "সে কৃষ্ণবাবুর জামাতা শচীনবাবুর একটি সোনার ঘড়ী সরাইয়াছিল, এজন্য মহেশবাবু তাহাকে পুনরায় আদালতে দিয়া আসেন। তথায় সে বেশ্যাবৃত্তি করিবার অনুমতি চায়, বিচারক অগত্যা তাহাকে তথাস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দেন।"

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল এমন সময় সুরুচি হাসিতে হাসিতে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে নানাবিধ ফুল ফল কেক্ বিস্কুট প্রভৃতি রহিয়াছে। আমি তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিল "মানদি, আজ মোটরে চড়ে হগ্ সাহেবের বাজারে গিয়েছিলুম, এই সব কিনে এনেছি, কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে তোমার চা-এর নিমন্ত্রণ, যেও। ভাল কথা, আজ সেই বুড়ো মহেশ আতর্থীর সঙ্গে দেখা হ'ল, আমি বল্লুম, কি বুড়ো, কেমন আছ? বলিতে বলিতে সুরুচি হি হি করিয়া অবিরাম হাসিতে লাগিল।

তারকবাবু সুরুচির সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন জানি না, আমি সুরুচি ও উষার কথা ভাবিয়া দেখিলাম, ইহারা আমারই মত হতভাগিনী। যৌবনের প্রারম্ভে প্রলোভনের বশীভূত হইয়া সংযমের বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—আর ত অকূল সমুদ্রে কূল পাইতেছে না। ইহারাও আমার মত সৎপথে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল; কিন্তু আমারই মত ইহাদের অদৃষ্টেও বোধ হয় আরও দুঃখ ভোগ আছে, তাই অনিবার্য্য কর্ম্মফল কেহ খণ্ডাইতে পারিল না।

দশম

অভিনয় পল্লী

সোনাগাছীতে আসিবার পর আমার উপার্জ্জন অনেক কমিয়া যায়; শরীরও নানা রোগাক্রমণের ফলে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে, ঘরভাড়া, খাওয়া পরা, ঠাকুর, চাকর, ঔষধাদি বাবদে বহু টাকা আমার খরচ হইত। পূজা-পার্ব্বণও কিছু করিতাম, বিশেষতঃ সরস্বতী পূজা আমার কখনও বাদ যাইত না। তাহাতে খুব সমারোহ হইত, এই সকল অতিরিক্ত খরচ আমার রোজগারে আর কুলাইয়া উঠিত না।

একজন উকীল ও একজন ব্যারিষ্টার আমার ঘরে আসিত, ইহারা আইন ব্যবসায়ে যেমন পরস্পর সহযোগী, ছিল,—আমার কাছেও সেই ভাবেই যাওয়া আসা করিত; আমাদের পতিতা-নারী সমাজের একটা রীতি এখানে উল্লেখ করিতেছি। বাবুর বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত কুভাবে আসক্ত হওয়া পতিতা-নারীর পক্ষে নিন্দার বিষয়, অবশ্য প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অনেক বেশ্যা গোপনে এই নিয়ম পদ দলিত করিয়া থাকে, কিন্তু পতিতা সমাজে তাহার দুর্ণাম রটে। ভদ্র সমাজে অনেক সময় যে সকল বন্ধু বিচ্ছেদ দেখা যায় তাহার কতক এই বেশ্যা পল্লীর বাবু ও বন্ধু লইয়া ঘটে, এমন কি ইহার ফলে মারামারি খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

আমি অভাবে পড়িয়া অর্থলোভে এই দুই বন্ধুকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখি নাই।

আমার এ প্রকার কার্য্যের জন্য পতিতারা অনেকে আমায় নিন্দা করিত, আমি ভাবিতাম সমুদ্রে যার শয়ন, শিশির বিন্দুতে তার কি ভয়?—পতিতাই যখন হইয়াছি তখন কলঙ্কের পসরা ত মাথায় নিয়াছি। বলিদান নাটকের পাগলীর সেই গানটী মনে পড়ে,—

কলঙ্ক যার মাথার মণি,
লুকান প্রেম তারই সাজে,

নরকে যখন ডুবিয়াছি, তখন একেবারে ইহার গভীর তলায় যাব—দেখি পরতে পরতে কত রকমের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

ক্রমশঃ দেখিলাম, এই উকীল ব্যারিষ্টার বাবুদের পরিচয়ে দুই একজন উঁচু দরের লোক আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট অনেক টাকা পাইলাম। আমার মাথায় এক নূতন ফন্দি আসিল। আমি জানিতাম, কলিকাতায় অনেক বড় বড় লোকের কাছে এই উকীল ব্যারিষ্টারদের যাতায়াত ও আলাপ পরিচয় আছে। সেই সকল বড় লোককে আমার ঘরে আনিবার জন্য আমি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম, কথা রহিল, টাকার অর্দ্ধেক তাহারা দুইজনে পাইবে।

আমি এবারে খাঁটী বেশ্যা হইলাম। রামবাগানে থাকিতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রাস্তা হইতে দুই একটী বাবুকে ফুস্‌লাইয়া আমার ঘরে আনিত। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের শাসনে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সহরে ভদ্রলোকও

বেশ্যার দালালী করে, তাহা জানিতাম। কোন কোন পতিতা নারীর নিকট আমি ভদ্রলোক দালাল রাখিবার পরামর্শ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমার বিবেক ও নীতিজ্ঞান একটু ছিল বলিয়া তাহা পারি নাই। আজ পাপ পথের শেষ সীমায় আসিয়া হৃদয়ের অবশিষ্ট সদ্ভাবটুকুকে পদ দলিত করিতে আমি আর ইতস্ততঃ করিলাম না।

আমার উকীল ব্যারিষ্টার দালাল দুইটা বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান, দালালী কার্য্যে তাহারা খুব পটু। দিনের পর দিন তাহারা আমার ঘরে বড় বড় লোক আনিতে লাগিল। কেহ উচ্চশিক্ষিত জমিদার-পুত্র,—কেহ রাজনীতিক নেতা, কেহ খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ সমাজ সংস্কারক,—কেহ ধনী-ব্যবসায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যাই অধিক। বাংলাদেশের বাহিরের লোকও আসিতে লাগিল।

চারি পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার হাতে কিছু টাকা জমিল। আমার দালালেরাও প্রচুর অর্থ পাইল। আমি আমার মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমি কতক্ষুদ্র, কত হীন হইয়াছি, নিত্য মিথ্যাচার, প্রতিদিন প্রতারণা—কেবল অর্থগৃধ্নতা—ইহার ফলে আমার হৃদয় যেন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের মত হইয়া উঠিল। দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝিলাম আমার সে লাবণ্য নাই—সে কান্তি নাই, নরকের ঘৃণিত ছবি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

অভিনব পন্থা

মিস্ মুখার্জ্জি

বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে সোনাগাছিতে আবার আমার গ্রাহক ও অনুগ্রাহকের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু দুর্দ্দিনের সে সূত্রপাতেও আমার ঐ উকিল ও ব্যারিষ্টার বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদিগের পরামর্শে আমি স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক ভবানীপুরে আসিয়া নূতনভাবে জীবিকা অর্জ্জন আরম্ভ করিলাম। মনস্তত্ত্ববিদগণ জানেন এবং দীর্ঘকাল এই ঘৃণিত ব্যবসায় উপলক্ষে আমিও এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম যে জগতে যাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য তাহা প্রকৃত পক্ষে সুন্দর হইলেও তত মোহজনক হয়না; কিন্তু যাহা দুষ্প্রাপ্য ও অপেক্ষাকৃত দুর্লভ, তাহাই সমধিক প্রলোভনের বস্তু। আমি ভবানীপুরে একটী সুরম্য ভবনে মিস্ মুখার্জ্জি নামে ব্যারিষ্টার সাহেবটির শ্যালিকারূপে সাধারণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসর জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলও ফলিল। বাল্যে এবং কৈশোরে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, পরে মানব সমাজের নানাস্তরের নানাপ্রকার জীবের সহিত অবাধ মিলনে মনুষ্য হৃদয়ের অতি গূঢ় তত্ত্বও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সুতরাং মিস্ মুখার্জ্জি-রূপে যখন সভ্য বন্ধু মহলে হাস্যরসিকতার অভিনয় করিতাম, যখন আপ-টু-ডেট্ সাজ সজ্জার হাবভাব বিলাসে বিগতপ্রায় যৌবনশ্রীর নূতন সংস্করণ লুব্ধ লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতাম,

যখন পার্কে হাত ধরাধরি করিয়া ভগিনীপতি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতাম, যখন একটিমাত্র কটাক্ষে অপরিচিতকে পরিচিতের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া বাটিতে আনিয়া স্বহস্তে পরিপাটিরূপে চা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতাম ও সঙ্গলিপ্সার দুর্দ্দম্য বেগ তাঁহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতাম, যেন আমার হৃদয়ের সে আবিল স্বার্থদুষ্ট রূপ কাহারও নয়নপথে পড়িত না, বরং উর্ণনাভের বিস্তৃত জালে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আমার সহিত নিভৃত আলাপের অনুসন্ধান করিতেন। অবশ্য বলিতে হইবে আমিও কাহাকেও অপরিতৃপ্ত রাখিতাম না। যাঁহার যখন উদয় হইত তিনিই যে আমার হৃদয় কমলের একমাত্র ভৃঙ্গ এবং অন্য সকলকেই মরিচীকা লইয়া ফিরিতে হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিতাম।

কত সতীত্বের ভানই করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ করিলেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। একদিন সন্ধ্যার সময় সম্মুখে টিপয়ের একদিকে মিঃ গোস্বামী ও অপর দিকে প্রফেসর চৌধুরী। উভয়েই ধনী, উভয়েই সুপুরুষ। আমি হারমোনিয়মটি অঙ্কে স্থাপন করিয়া বেশভূষার পারিপাট্যের পরিবর্ত্তে ইচ্ছাকৃত একটু অযত্নের ভাবে উন্মাদনা বৃদ্ধি করিয়া গান ধরিয়াছিলাম—

আজি অভিসার রজনী!

কোথা সে আমার কতদূরে তার দেখা পাব বল সজনি!
প্রেমের কমল ফুটেছিল তারই আলোক রেখার পরশে
দিন দিন করি বিতানু জীবন তাহারই পাবার হরষে।

মিঃ গোস্বামী বলিলেন—এখন বলুনতো কে সে এই ভাগ্যবান

আমি বলিলাম—সে একটী মানস-পুরুষ, একটী আদর্শ প্রণয়ী, বাস্তব জগতের কোন প্রাণী না হইতেও পারে। এমন সময় মিঃ চৌধুরী আমার পশ্চাদিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন ঐ যে সে পুরুষ-প্রবর আপনি আসিয়াই ধরা দিল। আমি ফিরিয়া চাহিতেই তুজনে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম আমার উকীল বাবুর সহিত আধুনিক সমাজের একটী নিতান্ত অচল বেশধারী অর্দ্ধবয়স্ক মাণিক। আহা—তাতে ছিলনা কি? ঘড়ি, চেন, গন্ধতেল, আতর, চশমা, ছড়ি, শাল, ফুলমোজা, পানে পানে ফাটা ফাটা একজোড়া ঠোঁট, মুখের মত চলন বলন এবং যাহা কিছু অশোভনীয় তার সবই। তিনি আসিয়াই বলিলেন—আমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার অপ্সরা কণ্ঠ শুনিতেছিলাম। এ রকম আর একবার শুনেছিলাম। ওঃ বহুদিনের কথা, এই কলকাতা রামবাগানের মতি বিবির বাড়ী। আমি পূর্ব্ব বঙ্গের একজন পাট ব্যবসায়ী। আমার পয়সা খায়নি এমন মেয়ে মানুষ সহরে কম। কিন্তু আজ তোমার বাড়ী যা শুনলাম, জীবনে আর কোথাও তা শুনবনা, তোমার কানাচ আর ছাড়বনা। এঁরা কারা। এই কথা বলিয়াই তিনি একটী গিনি দিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁদের ভাব দেখিয়া আমি একটা ঘৃণাসূচক ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিলাম—দরোয়ান দরোয়ান! দরোয়ান হাজির হইলে বলিলাম, ইস্কো নিকাল দেও। পরে নিজেই সে কার্য্যের ভার লইয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম এবং রাস্তার ধারে গেটের কাছে আনিয়া

একটী চুম্বনে বিদায় দিলাম। বলিলাম, আমি তোমারই; তবে সময় বুঝিয়া কথা কহিতে হয়। যাঁরা বসিয়া ছিলেন তাঁরা আমাকে সহোদরার মত দেখেন।

ক্রমশই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল; দুজনেই নাছোড়বান্দা। উভয়েরই ধৈর্য্যের সীমা নাই। মিঃ গোস্বামী পকেট হইতে হ্যামিল্টনের বাড়ীর তাঁর সোণার সিগারেট কেসটী টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, আমি কেস্ হইতে সবগুলি বাহির করিয়া একটী কাগজের মোড়কে বন্ধ করিয়া কেসটি আলমারী ব... করিয়া বলিলাম—অন্ততঃ ঐ মূল্যবান জিনিষটির অনুরোধেও আপনাকে প্রতি সন্ধ্যায় একবার মিস্ মুখার্জ্জির শরণাগত হ'তে হবে; কেবল যে দিন হ'তে মিস্ মুখার্জ্জিতে আপনার স্নেহের অভাব দেখ্‌ব সেইদিন এটা ফিরে পাবেন। মিঃ গোস্বামী একটু বিহ্বল ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—সেটা কি কখনও সম্ভব হবে? আপনাকে ভুলব? মিঃ চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন, তাহলে কেস্‌টি মহাশয়ের পকেটে প্রত্যাবর্ত্তনও আর করলনা দেখ্‌ছি। মিঃ গোস্বামী তাঁর সিগারেট কেস্‌টির অসগদতির জন্য অনুতপ্ত হইয়া একটু নীরব ভাব অবলম্বন করিতেই আমি একটু আঘাত করিলাম—বলিলাম, কি রকম, বড় বাড়ীর কথা ভাবছেন নাকি? তিনি বল্লেন সে আবার কি? আমি বল্লাম—Lion's denএ (সিংহের গহ্বরে) একটা beautiful cubএর (সুন্দর সিংহের বাচ্চা) শিকারে যাবেন ভাবছেন ত? তিনি what a fiction বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেই মিঃ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন—But facts are more strange than

fiction, (অর্থাৎ বাস্তব জগতের ঘটনা গুলি কল্পনা রাজ্যের অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যজনক হয়ে থাকে)।

মিষ্টার গোস্বামীর অন্তর্ধানের সঙ্গেসঙ্গেই আমার যেন একটু শিরঃপীড়া বোধ হইতে লাগিল। আর একটি অসুখ,যাকে Palpitation of the heart (যাকে হৃদপিণ্ডের ধরফড়ানি বলে) সেই রোগটি সময় বুঝে দেখা দিল। দুরাত্মার ছলের অভাব নাই, আমি বেশ একটু যেন কাতর হইয়া শোফায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম; আর, ওঃ—লাইট্‌টা কি ষ্ট্রং বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই মিঃ চৌধুরী নিঃশব্দে আলোকটি সুইচ্‌ অফ্‌ করিয়া দিলেন। তখন চাঁদের কিরণ ঘরে আসিয়া পরিয়াছিল; মিঃ চৌধুরী আমার নিকটে তাঁর চেয়ারখানি টানিয়া আনিতেই আমি তাঁর হাতটি টানিয়া আনিয়া বুকের উপর রাখিয়া বলিলাম—আহা, মিঃ চৌধুরী, আজ গোস্বামীকে কি রকম জব্দ করেছি বলুনত। ৩০০৲ টাকার কেস্‌টি যে হজম করলাম এটি অবশ্য বুঝতে বাকি নেই, আরও কি আসবে বলেন। তিনি যেমন একটা উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁর হাতের আংটিটা খুলিয়া লইয়া বলিলাম, আপনাদের উভয়েরই আজ পরীক্ষা। ত্যাগের আঁচেই ভাই প্রণয়ের গাদ কাটে, বলিয়া গুণ গুণ করিয়া একটু সুর তুলিলাম :—

পিরীতের কষ্টি পাতরে
আজ তোমায় কষব পরাণ······

এমন সময় ব্যারিষ্টার বন্ধুটি আসিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, চাঁদের আলোয় দুটি প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া,তাহলে Let

১১

me retire for the night. (তা'হলে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম লাভ করি) বলিয়া দরজাটি বাহির হইবার সময় টানিয়া দিয়া গেলেন। আমার এই দালাল বন্ধু দুটির নিজ নিজ ব্যবসায়ে পসার হয় নাই, সেই জন্য আমার এই কার্য্যে তাঁহারা সহায়তা করেন, দালালির অংশ আধাআধি।

কিন্তু আশা মিটে কৈ ? খরচও সঙ্কুলান হয় না, বিশেষতঃ এই মহাপাপের পয়সারও আবার বখরাদার দুইজন। একদিন ব্যারিষ্টারকে বলিলাম—তুমি একেবারে অকর্ম্মা। এত জায়গায় জাল ফেল্‌লে একটিও রুই কাতলা গাঁথতে পারলেনা। রাজধানীর আশে পাশে জাল হাতে করে ঘুরলে হবেনা, একটু দূরে যাও। যে বাঙ্গালটি, সেই যে পাট ব্যবসায়ী গুহ, সেটি বেশ জবর মক্কেল ছিল, দর্শনেই এক গিনি, স্পর্শনে হয়ত পাটের সওদাগরী জাহাজও খান কতক এই গহ্বরে রেখে যেত। পারবে ধরতে তাকে।

কিছুদিনের জন্য ব্যারিষ্টার দালাল উধাও হইলেন। শেষে একটী প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিলেন। আসাম হইতে বেশ একটি ভদ্রবেশধারী ধনবান মনুষ্য গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। তিনি চিরকুমার। যুবক ও যুবতীগণের মধ্যে চিরকুমার ও চিরকুমারী ব্রত প্রচারের জন্য তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই। তিনি প্রথম দিনেই আমাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিয়া রজনীযোগে চির-কৌমার্য্যের মহিমা কীর্ত্তন সুরু করিয়া দিলেন। আমি কপটাচারে চিরদিনই অভ্যস্ত। গভীর রাত্রে তাঁহার সঙ্গে একাকী এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব বলিয়া রাত্রির জলযোগ শেষ করিয়া লইলাম।

মধ্যরাত্রে আলো জ্বালিয়া, ফ্যান্ খুলিয়া দিয়া, যুবক যুবতীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে লক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কঠোর অশুভ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, ঈশ্বরের এই পবিত্র রাজ্যে মানুষ নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে পাপ পথে সর্ব্বদা নর নারীকে আকর্ষণ করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাকে একটী প্যাকেট হইতে কতকগুলি প্যারিসের ছবি খুলিয়া এক একটী করিয়া দেখাইতে লাগিলাম।

___ যে পাকা শিকারী সে কখনও চিড়িয়ার প্রাণ বধ করেনা, সিংহ,ব্যাঘ্র প্রভৃতি জবরদস্ত হিংস্রজন্তুই তাহাদের শিকারের বস্তু।

যখন ছবিগুলি দেখাইয়া, তাহার মধ্যে কোন্ অংশ কিরূপ অশ্লীল, বিশেষভাবে তাহার বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম যেন তাহার আস্ফালন অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে, তিনি আগ্রহ সহকারে সেগুলি যেন দুই চোক দিয়া গিলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর বলিলাম, নর নারীর বিবাহে বা প্রণয় মিলনে এই সব ঘৃণিত কার্য্যই সম্পাদিত হয়। আপনি যদি চিরকুমার ব্রত ধারণ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন আমিও আপনার সহিত চিরকুমারীরূপে এই মহান্ ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিব। তিনি বলিলেন, এরূপ ছবি আরও আছে। আমি তখন একটী বাক্স আনিয়া তাঁহার নিকট হাজির করিলাম; তিনি উৎসাহ সহকারে আমার নিকট এমন ভাবে ঘেসিয়া বসিলেন যে কপট চিরকুমারী আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেয়ারটি সরাইয়া লইলাম। তিনি বলিলেন—আপনি কিজন্য এতগুলি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পাপ হইতে দূরে থাকিতে

হইলে পাপের স্বরূপ পূর্ব্বে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাই এই গুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যখন নিভৃতে এইগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ইহাদের কুৎসিত ভাবগুলি আলোচনা করি, তখন কি একটা ঘৃণিত লিপ্সা প্রাণে জাগিয়া উঠে, যেন, ছিছি সে কথা বলিতে লজ্জা মনে হয়। আপনি চির-কুমার ব্রতধারী, বলিতে লজ্জা করে, তখন মনে হয়—বোধ হয় অতি নিকট-আত্মীয় বিরুদ্ধ সম্পর্কীয় একজন সুবেশধারী যুব-কের সঙ্গও আমার পক্ষে নিরাপদ নহে।

ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। আমি বিশ্রামের প্রস্তাব করিলাম। তিনি সম্মত হইলে, উভয়ে একই কক্ষে শয়ন করিলাম, আমি নিদ্রার ভান করিয়া নীরব রহিলাম, কিন্তু জাগ্রত ছিলাম, তিনিও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। আমি পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম, তিনি মহাধনী। এক্ষণে সাড়া দিয়া বলিলাম—এই বাড়ীখানি আমি ভাড়া লইয়াছি, বিশ হাজার টাকা হইলে এখানি নিজস্ব করিয়া, এইখানে দু'জনে থাকিয়া এই মহামন্ত্রের প্রচার করিতে সমর্থ হই, নচেৎ শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তিনমাসের বাড়ীভাড়া ১০০৲ টাকা হিসাবে বাকী পরিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার হইলেন। বলিলেন—যদি আপনার মত সঙ্গী পাই তবে যথাসর্ব্বস্ব এই কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। বুঝিলাম তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছি। তখনও তাঁহার নিদ্রা আসে নাই আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না, তখন আমার পবিত্র ব্রতধারী, আমার জীবন সঙ্গীর একটু পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম। নিকটে আসিয়া বলিলাম—নূতন স্থানে আসিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে;

একটু তোয়াজ করিলেই সুস্থ হইতে পারিবেন। আমার আর তখন ভয় কি? তিনিও পবিত্র আমিও পবিত্র। তাঁহার মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়া কেশগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। বলিলাম যুবক বা যুবতীর মনের দৃঢ়তারও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। প্যারিস্ ছবিগুলির একটি ছবিরপ্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার মানসপটে ভাবটি চিত্রিত করিয়া দিলাম,তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, আমি তাঁহার শোচনীয় অবস্থা অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমরা পিশাচী, পৈশাচিক আনন্দই আমাদের আনন্দ। তাঁহাকে এই পর্য্যন্ত পাপের পথে এগাইয়া দিয়া, তাঁহারই অনতিদূরে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে কি দেখিলাম! একদিন পূর্ব্বে যিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, যিনি কখনও কাহারও পাণিপীড়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ছিলেন,তিনিই একরাত্রির মধ্যে আমার পরম ভক্ত, অনুগত দাসে পরিণত হইয়াছেন। যে নারী সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় তাঁহার পরিত্যজ্য সেই নারী শিরোমণি আমি বারবিলাসিনী মানী, ওরফে মিস্ মুখার্জ্জি ভিন্ন তাঁর অন্ন রোচেনা। চা আসিল বিস্কুট আসিল, নিষিদ্ধ পক্ষীর এক জোড়া ডিম আসিল, কিন্তু তাঁহার মুগ্ধনেত্র আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। আমি যাইয়া যখন চা পানে রত হইলাম, তখন তিনি শীতল চা-টুকু ঢোকে ঢোকে গিলিতে লাগিলেন।

বাড়ী ক্রয় করিবার জন্য দুইতিন মাসের মধ্যে বিশহাজার টাকা আমার হস্তগত হইল। আমার অঙ্গ মণি কাঞ্চনাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইল। অলঙ্কারে আমি আপত্তি করি-

লেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম—আমিই চিরকুমারী থাকিয়া ব্রত উদ্যাপন করিব, তিনি অনায়াসে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, আশ্রমের সেরূপ ওলট পালট করিতে আমাকে নাকি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই কর্ণে দুই হস্তের দু'টি অঙ্গুলি প্রদান করিতেই, অসাবধানতা বশতঃ তাঁহার সম্মুখে বে-আব্রু হইয়া পরিলাম,তিনি উন্মত্তের মত আসিয়া আমাকে গভীর আলিঙ্গনে নিস্পীড়িত করিয়া গণ্ডদেশে এক-নিশ্বাসব্যাপী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

তারপরই একদিন সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব। আমি বলিলাম এর কর্ত্তা আমি নই,দাদা-বাবু। দাদা-বাবু আসামীর সঙ্গে বাঙ্গালী শিক্ষিতা যুবতীর এরূপ মিলন অসম্ভব বলায়,আমার গবচন্দ্র প্রণয়ীটি কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

কুমার গোপিকারমণ রায় উল্লিখিত জমিদার যুবকের নাকি বিশেষ বন্ধু,কুমার বাহাদুরের আলয়ে আমার হতাশ প্রণয়ী নিমন্ত্রিত হইতেন, শুনিয়াছি। কতদিন ইনি কুমার বাহাদুরের গৃহে আমাকেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তবে আমি কুমার বাহদুরকে একদিনের জন্য আমার প্রণয়ীর মারফত, আমার কুটীরে পদধূলি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম,কিন্তু জানিনা কি অপরাধে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেন নাই। ঐসময় আমি বেশ্যা বলিয়া পরিচিত ছিলামনা। আমার এই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকার কত কথাই লিখিলাম। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কত ঘৃণিতকার্য্য করিতে পারে তাহাও দেখাইলাম। যাহা পবিত্র, মানুষ তাহাকে কলুষিত করিতে

বিশেষভাবে চেষ্টিত। যে মুখখানি আবরণ হীন, লোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা, যাহা আবৃত, যাহা পাপস্পর্শে মলিন হইয়া যায়,লোক তাহাতেই আকৃষ্ট। যে নারী প্রকাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, পুরুষ তাহা চায় না। অথচ যে কুলমহিলা পাপস্পর্শে সদা ভীত,পাপাত্মাগণ তাহাকেই পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চায়। হায়,আমার চিরকুমার ব্রতধারীর কি পরিণামই ঘটিল। কোথায় সেই ব্রত! কোথায় তার উদ্যাপন! এত অল্পদিনে নারী স্পর্শেই তাঁর দৃঢ় হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্কল্প বিকল্পে পরিণত হইল। তিনি ধন,মান, যশ হারাইয়াছেন, এত অল্পদিনেই আমার চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়া ধন্যহইলেন। আমি কাহাকেও ক্ষমা করি নাই। সুন্দর রাজ অট্টালিকাবাসী ধনী মাড়োয়ারী মহলেও আমার বিশেষ কদর ছিল। তাহাদের কতক অর্থও আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার উকিল দালাল একজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারিকে আনিয়াছিলেন। সে আমাকে দেখিবামাত্র বলিল—বিবি সায়েব,স্বজাতীয় নাদাপেটী মাড়োয়ারী নারীতে কোথাও শোভা নাই। বিদেশীয় আস্বাদেই পরমতৃপ্তি। সে আমাকে সোহাগ করিতে বলিত। আমি তাহাকে প্রাণেশ্বর বলিয়া একটী করিয়া গিনি সংগ্রহ করিয়াছি। একটী চুম্বনের মুল্যস্বরূপ দুটী গিনিও হস্তগত করিয়াছি। একদিন বাগান বাড়ীতে যাইয়া আমি ৩০০৲ টাকা আদায় করিয়াছিলাম। যারা হিন্দু-ধর্ম্মের এমন ধ্বজা উড়ায় তারা যে এমন কামান্ধ, পরদার পরায়ণ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

একাদশ

টি-পার্টি

ভবানীপুরে উঠিয়া আসিয়াছি পর হইতে আমি মিস্ মুখার্জ্জি নামেই পরিচিতা। আমি এখন আর "মানদা" "ফিরোজা বিবি" বা "মানী দিদি" নহি। প্রতিদিন আমি নূতন নূতন মতলব আঁটিতে লাগিলাম। আমার এই মতলবের মধ্যে টি-পার্টি ছিল প্রধান। আফিস ছুটীর পর আমার দালাল দুই জনই আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীরই ছিলেন। দুই এক ঘণ্টা আলাপ পরিচয়েই আমার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটীকে বাছিয়া লইতে পারিতাম। এভাবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের দ্বারা আমার তেমন ভাল আয় হইত না, বিশেষতঃ এদের জন্যও খরচ হইত। বড়লোকের পকেটে হাত দিতে না পারিলে আমার ও দালাল দ্বয়ের কি করিয়া পোষাইবে।

একদিন ব্যারিষ্টার সাহেবকে বলিলাম, দেখ একটা কাজ কর—এই কলিকাতা সহরের বড় ব্যবসায়ী, বড় চাকুরে, ডেপুটী, মুন্সেফ, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, স্কুলের শিক্ষক, প্রফেসার, দেশকর্ম্মী, সংস্কারক—এদের মধ্যে যাহাদের পকেটে বেশ টাকা আছে, তা'দের প্রত্যেক শ্রেণী হইতে পাঁচজন ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে একটা ভাল পার্টির বন্দোবস্ত কর দেখি।

ব্যারিষ্টার সাহেব দিন চারের মধ্যে একটা লিষ্ট করিয়া

আমাকে দেখাইলেন, লিষ্ট মধ্যে পূর্ব্ব জীবনের পরিচিত তিনটী ভদ্রলোকের নাম আমি ছাঁটিয়া দিলাম। তিনি নূতন নাম দ্বারা তাহা পূরণ করিলেন। এক রবিবারে এই পার্টির আয়োজন হইল। আমার নামে ছাপান নিমন্ত্রণ কার্ড দারোয়ান দ্বারা পাঠান হইল। স্কুলের শিক্ষক এই নিমন্ত্রণে একজনও আসেন নাই; মুনসেফ্ মাত্র একজন আসিয়াছিলেন, তিনি পার্টি শেষ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান। দেশকর্ম্মী এবং উকিল ও ব্যারিষ্টার প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যেও প্রায় অনেকেই আসিয়াছিলেন।

জলযোগের সামান্য বন্দোবস্ত ছিল—আর ছিল বিলাতী তরল পদার্থ। অবশ্য এ জিনিসটা সকলের মধ্যে পরিবেশিত হয় নাই। এই উপলক্ষে একটা ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের চারটী গান আমি গাহিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রদীপকুমার রায়ও কয়েকটি গান গাহিয়াছিলেন। একটি দেশকর্ম্মী একটা স্বদেশ-সঙ্গীত গাহিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি এই নূতন গানটি গাহিয়াছিলাম।

হাত দিয়ে তুই বাঁধ্‌লি হাত
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁধ্‌লি না;
এযে সোণা ফেলে দিলি গের
আঁচলে তা' তুই বুঝ্‌লি না।
তিরিশ কোটি বন্ধু পেলে,
জগত জয় অবহেলে
করতিস্ তা আর পারলি না।

গান শেষ হইলে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল; একজন

কর্ম্মী পদ্ম সরকারের নিন্দা আরম্ভ করলেন—তাঁর নাকি কোথায় দুই একটা রক্ষিতা আছে, তাহার কথা, তাহার জাল জুয়াচুরির কথা তুলিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করিলেন। মিঃ ঘোষ ইহার প্রতিবাদ করিলে, অন্য এক দেশকর্ম্মী মিঃ ঘোষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। তিনি ইহাও বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন না যে,দেশবন্ধু এদের লাই দিয়ে বড় করে বড়ই ভুল করেছিলেন। দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন—এ কথাটাতে আমার প্রাণে যেন কেমন লাগিল,তখন আমিই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন কি ঠিক করিয়াছিলেন তাহা তোমার আমার মত লোকের বুঝিবার শক্তি নাই—সে অগাধ সমুদ্রের তলস্পর্শ তোমার আমার মত লোকের কায নয়। তিনি কাহারও উপর কোন কার্য্য বিশেষের জন্য বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা পোষণ করিতেন না। তিনি লোক চিনিতে পারিতেন বলিয়াই এমন লোকও স্থান দিয়াছিলেন। যেমন—"কুস্তিগির পালোয়ানকে" আয়ত্ত করিতে হ'লে কুস্তিগির পালোয়ানের প্রয়োজন, তেমনি এই লোক দ্বারাও তিনি তার উপযুক্ত কাজ করাইবার জন্যই রাখিয়াছেন!

এর পরও তিনি জেদ ছাড়িলেন না,বলিলেন"এ যে বিশ্বাসঘাতক"—সেই প্রমাণ বোধ হয় দেশবন্ধু পান নাই। এখন তার মূর্ত্তি বাহির হইয়া গিয়াছে—মহারাজা ক্ষৌণিশের কাছে গোপনে দলের খবর এ লোকটাই দিত।...তারা দিদির প্রণয়ীর এ অপমানটাতে আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল—প্রকাশ্যে বলিলাম—আচ্ছা আপনারা শ্লীলতার বাহিরে যান কেন?

বিশেষতঃ পদ্মবাবুর অসাক্ষাতে বলা কি ভাল! তার কথা না জানে কে,তাকে ত লোকে ঐ চক্ষুতেই দেখে। আজ যে পার্টিতে তাকে বলি নাই, কারণ, তাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে জানিলে হয়ত অনেক বিশিষ্ট লোকও না আসিতে পারেন।

এই ভদ্রলোকটী আবার বলিতে লাগিলেন—“বীরেন শাসমল, জিতেন বানার্জ্জি এবং হেমন্ত সরকার কেন চলিয়া গিয়াছেন—তাহা কি আপনারা জানেন?” আমি তাঁকে আর বাড়্তে না দিয়া কোন প্রকারে থামাইয়া রাখিলাম।

মিঃ ঘোষ, ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে অন্য ঘরে যাইয়া একটু টনিক খাইয়া আবার আসিলেন। তিনি বলিলেন—মিস্ মুখার্জ্জি —কিছু মনে করবেন না। সেদিন ঢাকার কাগজে দেখা গেল— কোন মেয়ে বোর্ডিংএ আবর্জ্জনার স্তূপে এক মৃত ভ্রূণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া ঢাকায় মহা হুলস্থূল। আজকাল যে প্রকার অবাধ মেলামেশা চলিতেছে—ইহারই ফলে এ ভ্রূণ হত্যা নহে কি? ঢাকার এক ভদ্রলোক বলিলেন, একটা নহে—অনেক।

আমি বলিলাম—অবাধ মেলামেশা দোষের নহে—নিজকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। এই যে মেয়েগুলি আজকাল ছেলেদের সঙ্গে এক কলেজে পড়্‌ছে—দেখুন তাদের কেমন সুন্দর চাল চল্‌তি, যেন ঠিক ভাই বোন। প্রকৃতির যা নিয়ম—ভাই বোন এক সঙ্গে—এরা ঠিক তাই। আমি শিক্ষিতা উদার মিস্ মুখার্জ্জি, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অবাধ মেলামেশা সমর্থন করিতে হইল। নইলে আমার মান থাকে কোথায়! অবাধ মেলামেশার জন্যই আজ আমি পতিতা।

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন—আপনি কি বল্‌তে চান যে—ঐ সব কলেজের ছেলেগুলি সব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। পূর্ণাঙ্গী মহিলা-দের কাছে সমস্ত দিন ঘুরে ফিরেও এদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। আমি বলিলাম—সকলের কি আর এক রকম হ'তে পারে? উহাতে কাহারও যদি ভাবান্তর হয়—এবং তা'তে যদি একটা কিছু হয়ই—তবুও তেমন দোষ কি? স্বাধীন দেশে ত এমন কত হচ্ছে—তাতে কি আসে যায়।

মিষ্টার ঘোষ তখন বলিলেন—"তবে কি আপনি এ দেশটাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় দেখ্‌তে চান?" ইহার উত্তর কি দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় মিঃ ঘোষ আবার বলিলেন—রুচীবাগীশ হেরম্ববাবু নাকি "থিয়েটারের বাড়ী দেখাইয়া দেওয়া" ও পাপ মনে করেন, কারণ উহাতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ যাইয়া থাকে তাহাদের নাকি মনোবৃত্তি ভাল নহে। আর আজ তা'র কলেজে যে সকল যুবক যুবতী একসঙ্গে পড়ে. তা'দের মনোবৃত্তি কেমন, তাহা যদি তিনি 'ব্যালটে' পরীক্ষা করেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন। হেরম্ববাবু কি অবাধ মেলা মেশার ফলে ঢাকার দুইটি ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহের ফল এবং তজ্জন্য এক পরিবারের পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় অবগত নহেন? রমলা গুপ্তা, লীলাবতী প্রভৃতি মোকদ্দমার বিষয় কি তিনি শুনেন নাই? রমলা গুপ্তাত তাঁদেরই সমাজের লোক।

এ বিষয়ে আমি আর বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেছিলাম না—বিশেষতঃ রাত্রি অধিক হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেকেই বিদায় গ্রহণ করিলেন, একটি খদ্দর পরিহিত যুবক রহিয়া গেলেন।

ইনি এখন কৌমার্য্য ব্রতপালন করিতেছেন—এর ও বাজারে যথেষ্ট সুনাম আছে। ভাবিলাম, এদের মত কুমার এবং আমার মত কুমারীর সংখ্যা যদি এমন ভাবে বৃদ্ধি হয় হবে এদেশের কি শোচনীয় পরিণাম!

গার্ডেন পার্টি

আমি নিজে পতিতা।—ত'ার উপর আবার সাজিয়াছি ভদ্র-ঘরের কুমারী, এই প্রকার জুয়াচুরী আর ভাল লাগিতেছে না। আমার হাতে হাজার কয়েক টাকা জমিয়াছে। এ হীন পাপ বৃত্তি আর করিব না কল্পনা করিতে ছিলাম, কিন্তু আমার দাদাল দুইজন ইহাতে অসুখী হন দেখিয়া অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিপ্ত আছি।

দেহ বিক্রয় করিবার জন্য বার বার আমায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল রাণীমাসী, সেজন্য তা'কে ততটা দোষ দেওয়া হয়ত চলেনা, কারণ উহাই ছিল তাহার ব্যবসা। কিন্তু আমার এই দালালদ্বয়, যাহারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া পরিচিত এবং উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রিও যা'দের আছে, তা'দের এই প্রকার প্রবৃত্তির বিষয় যখন ভাবিতাম, তখন মনে হইত—হায় এ জগতের কি কল্যাণ আছে! যে জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যার দালালি করে—দালালি করে কেন, বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে দেখিলে তাহাকে ঐ পাপ বৃত্তি করিতে প্রলুব্ধ করে, তাহারও ভদ্র এবং শিক্ষিত! আমি দেখিয়াছি, বারবনিতা সমাজেও কেহ এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, অনেক পতিতা এ সাহায্যই

করিয়া থাকে, কিন্তু ভদ্রনামধারী লোকের একি প্রবৃত্তি! সেদিন রামবাগানের অবস্থাপন্ন পতিতা নারী চুণী গলায়দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে; তাহার আত্মহত্যার কারণ সে এক চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল—"পতিতার জীবনে আমার ধিক্কার জন্মিয়াছে।" সে অন্যান্য পতিতাকেও এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। যে পাপবৃত্তি করিতে প্রাণ আর চাহেনা, তাহাতে লিপ্ত থাকিতে যে কি কষ্ট, তাহা কাহাকেও বুঝান যায় না। একদিন আমার উকিল দালালটি বলিলেন—দমদমায়··· বাবুর বাগানে একটা পার্টি দিব ঠিক করিয়াছি। আমি বলিলাম —দমদমায় আর কেন, যদি দিতেই হয় ভবোবাড়ীতেই দাও। তিনি শুনিলেন না, বাগানেই ভাল লোক জমে, ইহাই বুঝাইয়া বাগানে পার্টির উদ্যোগ করিলেন। আমার নামে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রও বিলি হইল, কিন্তু কাহারা যে নিমন্ত্রিত হইলেন সে খবর আমি নেই নাই। অনিচ্ছায় যে কাজ, তাহাতে তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে না। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমার নিজের মোটরে দমদমায় গেলাম। মোটর চালাইলেন খোদ ব্যারিষ্টার সাহেব। আমি তাঁর বামদিকে বসিয়াছিলাম, উকিল বাবু ছিলেন আমাদের পিছনে।

দমদমায় যাইয়া দেখি সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ২০।২৫ জন লোক বসিয়া আছেন। কয়েকটি খদ্দর পরিহিত যুবক নানা আয়োজনে ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কারা? উকিল বাবু বলিলেন, ইনি পার্টীর খরচ দিচ্ছেন···বাবু, এরা তাঁহারই লোক। যিনি খরচ বহন করিতেছেন তাঁহারও খদ্দরের

..মা কাপড় এবং পায়ে স্যাণ্ডেল দেখিয়া মনে মনে বড় বিরক্ত ..ইলাম। কারণ নিন্দিত পল্লীতে থাকিতেও এই প্রকারের খদ্দর ..রিহিত বহু যুবক প্রৌঢ়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ... ..য় হইয়াছে সামান্য। পুলিশগুলি যেমন ঐ সকল ..ল্লীতে তাহাদের পোষাকের দাপটে কাজ সারিয়া যায়, খদ্দর পরিহিত দেশকর্ম্মী ভলাণ্টিয়ার নামধারী অনেক যুবকও বলে —আমরা দেশের কাজে ব্রতী, পয়সা পাব কোথায়? অনেক ..বি এবং সাহিত্যিকের দলও রিয়েলিষ্টীক আর্টের খোঁজে ..ন্দিত পল্লীতে যাইয়া মার্জ্জিত কথা বলে, এবং বিনা খরচায় আর্টের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে, সুতরাং আমার বিরক্ত ..ওয়াটা যে খুব অন্যায় হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কোন ব্যবসায়ী লোক মনে করিবেন না।

..দিন শিষ্টতার খাতিরে একটা গান গাহিলাম। আমার পরে অন্য দুই একজনও গান ধরিলেন। গান শেষ হইলে নারী নিগ্রহের কথা উঠিল—সকলেই ইহার জন্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। মন্তব্য প্রকাশের প্রধান কারণ মুসলমান সমাজের নীরবতা। একজন মুসলমান ভদ্রলোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—হিন্দু নারীগণই মুসলমান দের সঙ্গে যায়, ইহা মুসলমানদের দোষ নহে। মৌলবী আক্রাম খাঁও এই প্রকার কথাই তাঁহাদের আহুত প্রতিবাদ সভায় বলিয়াছিলেন। এই পার্টি যেদিন হইয়াছিল তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বের কাগজেই ময়মনসিংহ সহরের ওভারসিয়ার শিক্ষিত মুসল-মান অব্দুল রহিমের অবিবাহিতা কন্যা এবং কটিহাদি থানার

১৭৫

গোলাম সাহেবের স্ত্রীর নির্য্যাতনের খবর দেখাইয়া বলিলাম, ই- কি হিন্দু ছিল, না, হিন্দু ইহাদের অপহরণ করিয়াছে। আত খাঁ সাহেবকে একটু ভাবিয়া ইহার উত্তর দিতে বলিবেন আব্দুল রহিম সাহেবের এই কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য গণ যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তেমন প্রাণপণ চেষ্টা মুসলমান গণও করেন নাই। থানার দারোগা ঘোষাল মহা হিন্দু, তিনি এজন্য আসমুদ্র হিমাচল মন্থনের আয়োজন করি ছিলেন। মৌলবী সাহেব এ বিষয়ে আর কোন জবাব দিতে না পারিয়া সৈনিক-কবি নজরুল ইছলামের বিবাহটা উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন, এবং হিন্দুর দোষেই এ বিবাহটা হইয়াছে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন 'নজরুল কি মেয়ের ভাইএর নিকট প্রস্তাব নিয়া প্রথমে যাইতে সাহসী হইত যদি সে...' আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, যাহাদের কোন শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হ- য়াছে, তাহাদের কথা উল্লেখ করা উচিত নয়, আপনি এ বিষয়ে কোন কথা বলিবেন না। তিনি বেশ একটু রাগের ভাব দেখাইয়া চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম ইহা এক মাত্র অবাধ মেলা মেশার পরিণাম, যদি বিবাহটা আরও কি দিন টিকিয়া যায় তবে হয়ত বা পাকা হইলেও হইতে পারে।

এই মৌলবী সাহেবটি এমনই নির্লজ্জ যে আবার বলিতে লাগিলেন—আজকাল রাস্তা ঘাটে যে সকল হিন্দুমেয়ে বে-আবরু চলা ফেরা করেন, তাঁহাদের অনেকের ডানদিগের অঙ্গ বিশেষের উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক সাড়ী না দিবার কারণ কি? আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। একথার কি উত্তর দিব। পতিতাগণও যে অঙ্গ রা...য়

...লিতে সাবধানে ঢাকিয়া চলে, আজকাল গৃহস্থ কুমারীও বিবাহিতাদিগের অনেকে উহা খোলা রাখা যেন ফ্যাসান মনে করেন। ইহার উত্তর নাই। বেশ একটু রুক্ষ মেজাজে তাঁহাকে বলিলাম—মহিলাদের সম্মান রাখিয়া যিনি কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার কথা না বলাই উচিত।

আমার এই কথায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান একসঙ্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রহিলেন দুই এক জন। যিনি পার্টিদাতার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হিন্দু মুসলমান মিলনের বিশেষ কর্ম্মী বলিয়া আমার দালাল আমাকে তাঁহার নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, তাঁহার মতলব আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি আমার দালালকে ঘৃণাভরে গোপনে বলিলাম; এ পাপবৃত্তি আজই শেষ, আর না। নিন্দিত পল্লীতেও যাহাদের গ্রহণ করি নাই আজ তুমি তাদের নিয়ে এসে হাজির! ধিক তোমাদের শিক্ষায়! দালালটি বলিল এ নাহ'লে যে হিন্দু-মুসলমান মিলন হয় না, তাই এদের বাদ দিয়ে পার্টি দেওয়া ভাল নহে। তাহাদের প্রকাশ্যে কিছু বলিলাম না, লোকটার রুচি যেন মার্জ্জিত বলিয়াই মনে হইল।

এমন সময় কেহ কেহ সর্দ্দার বিলের বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমার আর উহাতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু গায় পরে যখন আমার মতামত জানিতে চাহিল তখন আর কি করি! আমি যে শিক্ষিতা উদার নারীর আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া কথা কহিতে ছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমাদের পতিতা সমাজে যে হাজার হাজার কুমারী মেয়ে প্রথম যৌবন

উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবৈধ প্রেমে মজিয়া নিন্দিত পল্লীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে—তাহাদের কথাই মনে হইল। মনে হইল যাহারা নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই তাহারাই ত এখানে আসিয়াছে, তাহারাত সমাজের অতি সামান্য অংশ মাত্র। এ প্রকার গুপ্ত প্রেম কয়টা ধরা পড়ে? হাজারে দু-একটা বইত নয়?

প্রকাশ্যে বলিলাম—প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে রজোদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যখন মেয়েদের প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তখন ইহার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত। মৌলবী সাহেব বলিলেন—মিস্ মুখার্জ্জির মুখে এমন উত্তরের আশা আমরা করি নাই। আমি বলিলাম—আমি কেন—ঐ সেদিন যে নারীবাহিনী সর্দ্দার বি[illegible] সমর্থন করিতে টাউনহলে গিয়াছিল, তাহাদের যাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাও আমার মতেরই প্রতিধ্বনি করিবে। আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—ঢাকার ছাত্রী নিবাসের ভ্রূণহত্যা, দাস, গুহ পরিবারের অবৈধ বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বড় ঘরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলাম। সৈয়দ হুসেনের সঙ্গে নেহরু কন্যার পালায়নের কথাটাও বলিয়া ফেলিলাম।

শাস্ত্র আমি জানি না, জানিতেও চাহি না, কিন্তু প্রাণে ক্ষুধা থাকিলে যদি সুধার পাত্র সম্মুখে পায় তবে এমন বীর নারী কয়জন আছে যে বৎসরের পর বৎসর তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়? ইংলণ্ড, আমিরিকায় কি দেখিতেছি, সেখানে প্রতিশতে কুড়িটা ছাত্রী বিবাহের পূর্ব্বে সন্তান প্রসব

ইহাতে তাহাদের সমাজচ্যুত হইতে হয় না। যদি ভারতকে রা আমেরিকা করিতে চাও, তবে সে ভিন্ন কথা।

মৌলবী সাহেব তখন আলবার্ট হলে মেয়েদের সর্দ্দার বিবাহ বিল সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই সে দিন ২।৩ শত মহিলা আলবার্ট হলে মিলিত হইয়া "তালাক" আইনটাও পাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এর উত্তর আমি আর কি বলিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হায় হিন্দুনারী, আজ তোমার এ কি মনোবৃত্তি! তোমারা যে দেখ্‌ছি সারা ভারতটাকে সোণাগাছিতে পরিণত কর্‌তে পার্‌লে পরিতৃপ্ত হও। একথার কোন জবাব না দিয়া বলিলাম—চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অভিভাবককে কেহ যখন বাধ্য করে না, যদি উহা অকল্যাণ মনে করেন, তখন দেশকে বুঝাইয়া সেই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া পুলিশের হাতে হিন্দুর যৌন ব্যাপার যাহারা দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহারা দেশের ঘোর শত্রু। বিশেষতঃ আমরা যখন শীঘ্রই স্বরাজ পাইতেছি, তখন এ কয়টা মাস সবুর করিলে কি চলে না?

সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—এ পাপ ব্যবসায় আর করিব না। রিপু জয় করিতে পারি নাই বটে, চেষ্টা করিব। আমি এখন পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার যে টাকা আছে তাহার দ্বারা আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় চলিতে পারে। কবে মরিব ঠিক নাই—হয়ত আমার ধন আমার নিজ কার্য্যে ব্যয় না হইতেও পারে। দালালদ্বয় একটা উইল করিতে বলিলেন—আমি তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে

বলিলাম। খসড়া পড়িয়া দেখিলাম—আমা[র] মৃত্যুর পর
আমার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এই
লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম—তাহা হইতে পারে না—
মৃত্যুর পর—পতিত ও অন্ত্যজ জাতির সেবায় আমার ত্য
সম্পত্তি ব্যয় করিতে হইবে। পতিতার ত্যজ্য সম্পত্তি গবর্ণমেন্
নিয়া যান—তাহাতে পতিতার ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যই হ
না—এজন্য কলিকাতার কয়েকটি পতিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে—হিন্দু-
ধর্ম্মের যাঁহারা সংস্কারক এমন প্রতিষ্ঠা[নে] ... করিয়া
গিয়াছেন—আমিও তাহাই করিব স্থির করিয়া ... হি...ভা
এবং হিন্দুমিশন, এই সকল কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী।

সমাপ্ত

...RIAL LIBRARY

১৮০